ইস্‌লাহে
বেহেস্তী জেওর
اصلاح بہشتی زیور

(প্রথম খন্ড-আকায়েদ)

মুলঃ আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেজা খান (রহঃ) এর সুযোগ্য শাগ

শেরে মিল্লাত হযরত মাওলানা হাশমত আলী
সুন্নী হানাফী বেরলভী (রহঃ)

সংকলন ও অনুবাদ
অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল
(এম এম, এম এ, বিসিএস)

Click Here

Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

আশরাফ আলী থানবীর লিখিত শিরক ও কুফরিতে ভরপুর
এবং গলদপূর্ণ মসআলা-মাসায়েল-এ-ভর্তি "বেহেস্তি জেওর"
এর সংশোধনমূলক উর্দু কিতাবঃ

ইসলাহে
বেহেস্তি জেওর
اصلاح بہشتی زیور

(প্রথম খন্ড-আকায়েদ)

মূলঃ আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেজা খান (রহঃ) এর সুযোগ্য শাগরেদ

শেরে মিল্লাত হযরত মাওলানা হাশমত আলী
সুন্নী হানাফী বেরলভী (রহঃ)

সংকলন ও অনুবাদ
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল

গ্রন্থকার ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এম.এম, এম.এ, বি সি এস)
গ্রাম ঃ আমিয়াপুর, পোস্ট ঃ পাঠান বাজার, থানা ঃ মতলব (উত্তর), চাঁদপুর।
সাবেক অধ্যক্ষ ঃ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা

প্রকাশক ঃ
হোসাইন মুহাম্মদ জাওয়াদ
বরুমচরা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশ ঃ
১ লা রমজান ১৪১৮ হিজরী
১ লা জানুয়ারী ১৯৯৯ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণঃ
১০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইংরেজী

কম্পিউটারঃ শামস্ ফারাহ
মুদ্রণেঃ সূচনা প্রিন্টিং এন্ড এডভার্টাইজিং
৮৫/১, (চতুর্থ তলা), পুরানা পল্টন লেন, পল্টন, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৮১৯৫৩৬৩০৬, ০১৮১৯৯৩২০০১

পরিবেশনায়
উজ্জীবন লাইব্রেরী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইলঃ ০১৮১৫৪১০২৬২

প্রাপ্তি স্থানঃ
১.উজ্জীবন লাইব্রেরী
কাদেরিয়া তৈয়েবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা,
জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ।
২. ৩/৯ জয়েন্ট কোয়ার্টার, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
৩. **গাউছুল আজম জামে মসজিদ**, উত্তর শাহ্জাহানপুর, ঢাকা
৪. **মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা**, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম।
৫. **জাগরন ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স**,১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম।

হাদিয়াঃ সাদা-১৪০ টাকা

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
মূল গ্রন্থকার আল্লামা হাশমত আলী (রহঃ) এর কথা		v
অনুবাদকের কথা		vi
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		vii
বেহেস্তী জেওর সম্পর্কে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (রহঃ)-এর অভিমত		viii
প্রথম অধ্যায়	ঃ বেহেস্তী জেওরে বিদ্আত-এর ভুল সজ্ঞা ও তার খন্ডন	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ শিরক ও কুফর প্রসঙ্গ ঃ বেহেস্তী জেওরে কুফরের ফিরিস্তি ও তার সংশোধন	৮
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ তাকৃভিয়াতুল ঈমান কিতাবে ইসমাঈল দেহ্লভীর কুফরী আকিদা ও তার খন্ডন	৯
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ অলী আউলিয়াদের কাশ্ফ ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসঙ্গে বেহেস্তী জেওরের কুফরী আকিদা খন্ডন	১৭
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ দূর হতে কাউকে আহবান করা প্রসঙ্গে বেহেস্তী জেওরের আকিদা খন্ডন	২২
৬ষ্ঠ অধ্যায়	ঃ অলীগণের নিকট কিছু চাওয়া প্রসঙ্গে বেহেস্তী জেওরের আকিদা রদ	৩৩
সপ্তম অধ্যায়	ঃ কারও নামে রোজা রাখা প্রসঙ্গে বেহেস্তী জেওরের আকিদা রদ	৫৩
অষ্টম অধ্যায়	ঃ তাজিমী সিজ্দা ও ইবাদতের সিজদার পার্থক্য এবং শরীয়তের হুকুম	৫৮
নবম অধ্যায়	ঃ কোন অলীর নামে পশু ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে শরীয়তের হুকুম	৬২
দশম অধ্যায়	ঃ কোন অলী আল্লাহর নামে মানত করা প্রসঙ্গে শরীয়তের হুকুম	৬৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
একাদশ অধ্যায়	: মাজারের চারদিকে নিছবতের তাওয়াফ বা চককর দেয়া প্রসঙ্গে	৭২
দ্বাদশ অধ্যায়	: কারও সামনে মাথা নত করা এবং অচল মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গে	৭৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	: কারও নামে পশু জবেহ করা প্রসঙ্গে শরীয়তের তাহক্বীক	৭৯
চতুর্দশ অধ্যায়	: কারও নামের দোহাই দেয়ার তাহ্ক্বীক	৯০
পঞ্চদশ অধ্যায়	: কোন স্থানের তাজিম করা প্রসঙ্গে	৯৫
ষোড়শ অধ্যায়	: আবদুন্নবী, গোলাম জিলানী, নবী বখ্শ- ইত্যাদী নাম রাখা প্রসঙ্গে	১০০
সপ্তদশ অধ্যায়	: কোন বুযুর্গের নামের অজিফা পাঠ করার তাহ্ক্বীক	১০৮
অষ্টাদশ অধ্যায়	: আল্লাহ ও রাসুলের ইচ্ছায় অমুক কাজ হবে -প্রসঙ্গে।	১১০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসুলিহিল কারীম

মূল গ্রন্থকারের ভাষ্য - জরুরী আরজ

১। অত্র গ্রন্থে বেহেস্তী জেওরের কেবলমাত্র ঐ সমস্ত মাসায়েলের সংশোধন লেখা হয়েছে, যেগুলো আহ্‌লে সুন্নাতের আকিদার বরখেলাফ এবং মাযহাবের ইমামগণের তাহ্‌কীকেরও খেলাফ কিংবা ঢালাওভাবে বর্ণনার কারণে শরীয়তের হুকুম আহ্‌কাম পরিবর্তনকারী।

২। বেহেস্তী জেওরে যেসব মাসায়েল আমার দৃষ্টিতে সংশোধনযোগ্য বলে মনে হয়েছে, কেবলমাত্র সে গুলোরই সংশোধন করেছি। হয়তো বা কোন মস্‌আলা আমার দৃষ্টি হতে বাদ পড়েছে -যা সংশোধনযোগ্য। কোন বিজ্ঞ আলেমের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি নিজে সংশোধনী লিখবেন অথবা আমাকে জানাবেন। এমন খেয়াল করা উচিত হবেনা যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ওগুলো বাদ দিয়েছি।

৩। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামায়ে কেরামের খেদমতে আরজ- অধমের লেখায় ভুলভ্রান্তি পেলে তা সংশোধন করে দেবেন।

৪। বেহেস্তী জেওরের ঐসব খন্ড যা মাযহাবী আকিদা ও ধর্মীয় মাসায়েল সম্পৃক্ত, কেবল ওগুলোর সংশোধনই লেখা হয়েছে।

- হাশ্‌মত আলী রেজভী

অনুবাদকের কথা

ইসলাহে বেহেস্তী জেওর আল্লামা হাশমত আলী বেরেলভী (রহঃ)-এর লিখিত উর্দূ কিতাব। তিনি ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা শাহ আহমদ রেজা খান বেরেলভী (রহঃ)-এর অন্যতম শাগরিদ ও খলিফা এবং আশরাফ আলী থানবীর সমসাময়িক। এই গ্রন্থখানা বেহেস্তী জেওর-এর খন্ডন এবং থানবী সাহেবের জীবদ্দশায়ই ইহা লিখিত। আশরাফ আলী থানবীর উর্দূ বেহেস্তী জেওর মূলতঃ নারীদের জন্য লেখা কিতাব। এর পূর্ব নাম ছিল তা'লীমুন নিস্ওয়ান বা নারী শিক্ষা। বাংলা ভাষায় লিখিত মক্সুদুল মোমিনীন যেমন নারী সমাজে সমাদৃত হয়েছে, তেমনি তালীমুন নিস্ওয়ানও উর্দূ ভাষী নারীদের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পরবর্তীতে তালীমুন নিস্ওয়ান নাম পরিবর্তন করে বেহেস্তী জেওর নামকরণ করা হয়েছে। প্রথমে বেহেস্তী জেওরে মস্আলা মাসায়েলের শেষে কোন কিতাব বা দলীলের উল্লেখ ছিলনা। পরে তা সংযোজন করা হয়েছে।

আশরাফ আলী থানবী ছিলেন দেওবন্দের বড় আলেমগণের মধ্যে একজন। আকিদায় ছিলেন তিনি ওহাবীপন্থী। বাংলাদেশী লোকেরা আগের দিনে হিন্দুস্তানে গিয়ে লেখাপড়া করে আসতেন। হিন্দুস্তানে ওহাবী মাদ্রাসা হিসাবে দেওবন্দ দারুল উলুম ছিল প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা। সুন্নী মাদ্রাসা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল বেরেলী, মুরাদাবাদ, রামপুর ও ফয়েজাবাদ মাদ্রাসা সমূহ। ওহাবী মাদ্রাসা হিসাবে সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলুম এবং লাখনৌর নাদওয়াতুল উলামাও ছিল বিখ্যাত। ঐসব ওহাবী মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরে আশরাফ আলী থানবীর বেহেস্তী জেওর পাঠ্যভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীগণও প্রথমে বেহেস্তী জেওর সবক নিতেন।

ঐসব ওহাবী মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশী আলেমগণ দেশে ফিরে বিভিন্ন এলাকায় খারেজী মাদ্রাসা গড়ে তুলে এবং নাম দেয় দারুল উলুম, আশরাফুল উলুম, কাছিমুল উমুল, রশিদুল উলুম ইত্যাদি। বর্তমানে এগুলোর সম্মিলিত নাম দিয়েছে কওমী (জাতীয়) মাদ্রাসা-যদিও কওমী (জাতীয়) আকিদা বর্জিত। এসব মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে বেহেস্তী জেওর। উক্ত কিতাব পড়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীগণ ওহাবী আকিদার প্রথম পাঠ শিক্ষা করে। বর্তমানে বেহেস্তী জেওর বাংলায় অনুবাদ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আল্লামা হাশমত আলী সুন্নী হানাফী বেরেলভী (রহঃ)-এর লিখিত ইস্লাহে বেহেস্তী জেওর নামক উর্দূ গ্রন্থখানা বাংলায় সংকলন ও অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বেহেস্তী জেওর ও ইস্লাহে বেহেস্তী জেওর তুলনামূলক ভাবে পাঠ করলে পাঠকগন হক ও বাতিল নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন বলে অধম অনুবাদকের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিনীত

সংকলক ও অনুবাদক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নবী- রাসুল আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের প্রকৃত শান-মান ও মর্যাদা মানুষের বোধগম্যের অনেক উর্দ্ধে। আল্লাহ ছাড়া উনাদের হাকিকত উপলব্ধি করার সাধ্য কারোর নেই। তাই মানুষ বারে বারেই উনাদের সম্পর্কে ভুল করে। এর একমাত্র কারণ হলো নবী প্রেম ও অলী প্রেমের অভাব। কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন অংশের সমন্বয় না করে শুধু খন্ড খন্ড অংশের উদ্ধৃতিই ভুলের মূল কারণ। এই ভুলের শিকার হয়েছে ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়েম, ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী এবং তাদের অনুসারী ভারতীয় ওহাবী সম্প্রদায়। কিতাবুত তাওহীদ, তাকভিয়াতুল ঈমান, ফতোয়া রশিদিয়া ও বেহেস্তী জেওরের মাধ্যমে অসংখ্য লোক গোমরাহ হয়েছে এবং হচ্ছে। আল্লামা হাশমত আলী রেজভী (রহঃ) উর্দু ইসলাহে বেহেস্তী জেওর লিখে সে ভুল খন্ডন করেছেন এবং লক্ষ কোটি মানুষের ঈমান ও আকিদার হেফাজত করেছেন। তাই কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করছি।

ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়েবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার বয়োজ্যেষ্ঠ মোদাররেছ এবং আমার এককালীন সহকর্মী মরহুম মাওলানা আছাদুল্লাহ সাহেব আশির দশকের প্রথম দিকে আমাকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন উক্ত উর্দু ইসলাহে বেহেস্তী জেওরের বাংলা অনুবাদ করার জন্যে। কিন্তু কর্ম ব্যস্ততায় তখন তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মরহুম মাওলানা আছাদুল্লাহ সাহেবের প্রেরণাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে আল্লামা হাশমত আলী রেজভী (রঃ) সাহেবের উর্দু ইসলাহে বেহেস্তী জেওর খানার বাংলা অনুবাদ করতে। মরহুমের লাকশাম নরহরিপুর গ্রাম হতে উক্ত উর্দু কিতাব খানা সংগ্রহ করে সংকলন ও অনুবাদে হাত দেই। আশা করি মরহুমের রূহ মোবারক এতে শান্তি পাবেন। আমিও বিবেকের দংশন জ্বালা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি লাভ করেছি। আল্লাহ মরহুম মাওলানা আছাদুল্লাহ সাহেবকে বোলন্দ মর্তবা নছীব করুন। আমিন!

পুস্তক প্রকাশনার বিড়ম্বনা লেখক ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেনা। পান্ডুলিপি লিখা হলো- তো ছাপা হলোনা। ছাপার কাগজ খরিদ, কম্পিউটার টাইপিং ও আনুষাঙ্গিক খরচাদি এক বিরাট জমিদারী কারবার। অনুদান ছাড়া একার পক্ষে এ কাজ খুবই কঠিন ব্যাপার। নোবেল-নাটকের প্রকাশকরা উচ্চমূল্যে পান্ডুলিপি খরিদ করে নিলেও ধর্মীয় পুস্তকের বেলায় একেবারেই ঠান্ডা। তাই ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা একটু বেশী। ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (বাংলা) প্রকাশের ক্ষেত্রে যিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন- তিনি তরিকত পন্থী উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব জাকির খান চৌধুরী। তাঁর একক আগ্রহেই অত্র গ্রন্থখানা প্রকাশনার সুযোগ পেলো। সত্য প্রকাশের সিপাহসালার হিসাবে আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন- এতটুকুই আমার প্রার্থনা।

বিনীত

অনুবাদক

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসুলিহিল কারীম

(বেহেস্তী জেওর কিতাব সম্পর্কে ফতোয়ায়ে রেজভীয়ার অভিমত)

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন নিম্নবর্ণিত মস্‌আলা সম্পর্কে কি বলেন? বেহেস্তী জেওর কিতাবখানা কিরূপ কিতাব? উহা পাঠ করা যায়েজ কিনা ? উহাতে লিখা আছে - "কেউ যদি একথা বলে যে, আল্লাহ ও রাসুল ইচ্ছা করলে অমুক কাজটির সমাধা হয়ে যাবে - তা হলে তা শিরক হয়ে যাবে"। প্রশ্ন হলো- সত্যিই কি শিরক হবে, নাকি হবে না? উক্ত কিতাবে আরোও লেখা আছে "আল্লাহ্‌ তা'আলা কিছু মখলুক নূরের দ্বারা সৃষ্টি করে আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে রেখেছেন"। ইহা সঠিক- না বেঠিক ?

জওয়াব ঃ বেহেস্তী জেওর নামীয় কিতাবখানা মারাত্মক গলদ মাসায়েল ও অনেক গোমরাহীতে ভরপুর। উহা (গ্রহণ করার নিয়তে) পাঠ করা হারাম। উক্ত কিতাবের লেখক আশরাফ আলী থানবী সম্পর্কে হারামাঈন শরীফাঈনের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম, মুফতীয়ানে ইজাম ও শাইখুল ইসলামের ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। "হোস্‌সামুল হারামাঈন" নামের উক্ত ফতোয়া 'মাত্‌বায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, বেরেলী কর্তৃক প্রকাশিত। উক্ত ফতোয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, -ফিরিস্তাগণ নূরের সৃষ্টি এবং জনসাধারণের দৃষ্টি হতে গোপন। (আম্বিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টি হতে গোপন নন)।

আর "আল্লাহ ও রাসুলের ইচ্ছায় অমুক কাজটি হবে" বলার মধ্যে কোন দোষ নেই- যদি আল্লাহ ও রাসুলকে সমান মনে না করে। এমন কোন্‌ মুসলমান আছেন- যিনি (নাউজুবিল্লাহ) রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর সমকক্ষ বা শরীক বলে মনে করেন? এই মাস্‌আলার বিস্তারিত বিবরণ এবং অনুরূপ আকিদাগত অনেক মাসায়েল -এর বিস্তারিত বিবরণ আমার (আলা হযরত) লিখিত গ্রন্থ "আল আমনু ওয়াল উলা'য় লিখা আছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ"।

সুতরাং আলা হযরতের ফতোয়ায়ে রেজভীয়ার মন্তব্যের আলোকে এই অধম (আল্লামা হাশমত আলী) বেহেস্তী জেওরের গোমরাহীপূর্ণ আকিদা এবং গলদ মাস্‌আলাসমূহ খুঁজে বের করে স্তুপের মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ মুসলমানদের সামনে পেশ করছি -যাতে তারা সত্য অবগত হয়ে উক্ত গোমরাহী হতে বাঁচতে পারেন এবং মাযহাবের খেলাফ মাসায়েলের উপর আমল না করেন। যে সব মাস্‌আলা জানা না থাকে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞ সুন্নী আলেম থেকে জেনে নেবেন অথবা নির্ভরযোগ্য কিতাব দেখে নেবেন। যেসব কিতাব পাঠ করলে ঈমান ও আকিদা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে, ঈমানে দুর্বলতা আস্‌তে পারে- সে সব কিতাব কখনও পাঠ করা উচিৎ নয় এবং নিজ পরিবার পরিজনকেও পড়তে দেয়া উচিত নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে (হাশমত আলী) ও মুসলমানগণকে হেদায়াত নসীব করুন! আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথে পরিচালিত করুন। বে-দ্বীন ও গোম্‌রাহ লোকদের গোম্‌রাহী হতে আল্লাহ রক্ষা করুন!

হাশমত আলী রেজভী

ইস্‌লাহে বেহেস্তী জেওর
(আকায়েদ খন্ড)

প্রথম অধ্যায়ঃ

বিদ্‌আত প্রসঙ্গ ঃ

বেহেস্তী জেওর ঃ

اللہ ورسول نے دین کی سب باتیں قران اور حدیث میں
بندوں کو بتادیں- اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست
نہی- ایسی نئ بات کو بدعت کہتے ہیں- بدعت بہت بڑا
گناہ ہے -

অর্থঃ "আল্লাহ্‌ ও রাসুল দ্বীনের যাবতীয় কথা কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর ধর্মে নূতন কোন কথা যোগ করা বা আবিষ্কার করা দূরস্ত নয়। এমন সব নূতন কথাকে বিদ্‌আত বলা হয়। বিদ্‌আত অনেক বড় গুনাহের কাজ"।

সংশোধন ঃ

ধর্মের সহায়ক হিসাবে যেসব ব্যবস্থা পরবর্তীকালে ইসলামে সংযোজিত হয়েছে- ঐগুলোকে বিদ্‌আত বলা ঠিক নয় এবং ঐগুলোকে কবিরা গুনাহ্‌ বলাও গলদ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলামায়ে কেরামের মতামতেরও খেলাফ। বিদ্‌আতের এই অর্থ (থানবীর) করা হলে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি অনেক সাহাবী, ইমাম ও ওলামায়ে কেরামকে বিদ্‌আতী ও গুনাহ্‌গার বলতে হবে (নাউজুবিল্লাহ)। স্বয়ং থানবী সাহেব ও বিদ্‌আতী হওয়া থেকে রেহাই পাবেন না। ইসলাম ধর্মে এমন কিছু আমল ও কাজ আছে, যেগুলোর কথা কোরআন ও হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই। সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাবেঈন কিংবা ইমাম ও বুজুর্গানে দ্বীন ঐগুলো সংযোজন করেছেন- ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে। ঐসব আবিষ্কারের দ্বারা দ্বীন ও ধর্মের উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে এবং মুসলমানদের জীবনে অতীতে উপকার সাধিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সাধিত হবে। উদাহরণস্বরূপঃ রাসুল-পরবর্তী যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক কোরআন মজিদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করণ, হযরত ওমর ফারুক

(রাঃ) কর্তৃক বিশ রাকআত বিশিষ্ট তারাবিহ নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করার প্রচলন, হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক পবিত্র কোরআন শরীফ পারা, সুরা ও রুকু দ্বারা বিন্যস্ত করণ, জুমার প্রথম আযান প্রবর্তন, হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক ইলমে নাহু ও ইলমে সারফ প্রবর্তন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া কর্তৃক ৮৬ হিজরীতে কোরআন মজিদে প্রথমবারের মত ই'রাব ও হরকত সংযোজন এবং ওয়াক্‌ফ বা বিরতি চিহ্ন সংযোজন, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) কর্তৃক ৯৯ হিজরীতে হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ, আরও পরবর্তী যুগে হাদীস ও ফেকাহ্ গ্রন্থাদি প্রণয়ন, আরও পরে ইলমে কালাম, ইলমে মুনাজারা প্রণয়ন, তা'লীম ও বিদ্যা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা ও প্রয়োজনীয় উপকরন নির্মাণ-ইত্যাদি। থানবী সাহেবের বিদ্‌আতের সংজ্ঞা অনুযায়ী উল্লেখিত সবগুলোই হারাম, বিদ্‌আত ও শক্ত গুনাহের কাজ হয়ে যাবে। আমরা যে হরকত ও নুক্‌তাবিশিষ্ট কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করছি– উহা কি রাসুল বা সাহাবী কর্তৃক হয়েছে? যে সুরতে জামাআতের সাথে বিশ রাকআত তারাবীহ্ নামাজ বর্তমানে পড়া হচ্ছে– তা কি রাসুলের যুগে ছিল? জুম্‌আর দুই আযান কি রাসুল কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল বা কোরআনের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল? ইলমে নাহু কি রাসুলের যুগে ছিল? সিহাহ্ সিত্তার কিতাব কি রাসুলের যুগে ছিল? উপরের কোনটিই কোরআন বা হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়। ইজ্‌মা ও কিয়াসের মাধ্যমেই কোরআন ও হাদীসের আলোকে এগুলো করা হয়েছে। এগুলো সবাই মেনে চল্‌ছে। এমন কি থানবী সাহেব নিজেও। অথচ বেহেস্তী জেওরের সংজ্ঞা হিসাবে এগুলো বিদ্‌আত এবং বড় গুনাহের কাজ। (নাউজুবিল্লাহ)

অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে কোরআন মজিদকে স্বর্ণ ও রৌপ্য রংয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। ফকিহগণ অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। ইসলামী আইন সাজিয়ে তৈরী করা না হলে কত যে সমস্যা হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আকায়েদ সংক্রান্ত ইলমে কালাম ও ইলমে মোনাজারার পৃথক কিতাব রচনা করা না হলে ইহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক ইসলামের উপর বিভিন্ন অপবাদের জবাব সরাসরি কোরআন হাদীস থেকে দেয়া সম্ভব হতোনা। আর্য্য সমাজ, খৃষ্টান পাদ্রী, রাফেজী, খারেজী, ওহাবী, প্রকৃতিবাদী, কাদিয়ানী, মউদূদী, ইত্যাদি বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগে কিতাব রচিত না হলে সরলমনা মুসলমানগণ তাদের ফাঁদে পড়ে বেদ্বীন, মুশরিক ও কাফের হয়ে যেতো। সরাইখানা, মুসাফির খানা, পুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তরীকতের খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা পরবর্তী যুগেরই আবিষ্কার। ওয়াজ মাহফিল ও জিকিরের মাহফিল আয়োজন করা, লোকদেরকে একত্রিত করার জন্য দিন তারিখ নির্ধারন করা, মসজিদ সমূহের সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারুকার্য করা– ইত্যাদি কোরআন ও হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই। থানবী সাহেবের বেহেস্তী জেওরের ফতোয়া অনুযায়ী এগুলো বিদ্‌আত ও গুনাহের কাজ এবং এগুলোর আবিষ্কারকগণও মস্ত বড় গুনাহ্‌গার। তাহলে থানবী সাহেবের নিজস্ব লিখিত কিতাব সমূহের অবস্থা কি দাঁড়াবে? তাঁর ওয়াজের মজলিশের কি হুকুম হবে? তাঁর নিজের অবস্থাই বা কি হবে? নিশ্চয়ই গুনাহ্‌গার এবং জাহান্নামের উপযুক্ত (?)

উপরোক্ত প্রমাণ ও উদাহরণের মাধ্যমে প্রমানিত হলো যে, ধর্মে প্রবর্তিত প্রত্যেক নূতন জিনিষ বিদ্‌আত ও গুনাহ্ নয়। বরং ঐ সব কাজ বিদ্‌আত ও গুনাহ্, যেগুলো শরীয়তের দ্বারা সমর্থিত নয় এবং যেগুলো শরীয়তের পরিপন্থী কিংবা শরীয়তের নীতিমালার বহির্ভূত। যুগের সাথে বিদ্‌আতের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জমানায়ও যদি কেউ খেলাফে শরাহ কোন কাজ করে, তবে তাকেও বিদ্‌আত বলা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এভাবেই বিদ্‌আতের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেননা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا - (اِبْنُ مَاجَةْ)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রবর্তন করবে, সে ব্যক্তি উক্ত কাজের পুরস্কার তো পাবেই বরং উক্ত কাজের আমলকারীগণের সমান সওয়াবও পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের প্রবর্তন করবে, তার গুনাহ এবং আমলকারীগণের গুনাহ্‌ও তার উপর বর্তাবে- ইবনে মাজা।

এ হাদীসে নবী করিম (দঃ) উত্তম রীতিনীতি প্রবর্তনকারীর জন্য সুসংবাদ এবং খারাপ রীতিনীতি প্রবর্তনকারীর জন্য দুঃসংবাদের কথা ঘোষণা করেছেন। হাজার বছর পরে হোক– কিংবা আগে হোক-ভাল ভালই এবং খারাপ খারাপই হবে। এতে যুগের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং রাসুলের যুগের পরের কাজকে বিদ্‌আত বলা হলে উপরে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হবে।

শরীয়ত যে সব জিনিসকে ভাল বলেছে- লোকেরা সেগুলোকে খারাপ বললে কিংবা শরীয়ত যেসব জিনিসকে খারাপ বলেছে– সেগুলোকে লোকেরা ভাল মনে করলে -এমন কাজ প্রবর্তন করা নিশ্চয়ই বিদ্‌আত ও গোমরাহী। হাদিস শরীফে এমন কাজকেই বিদ্‌আত, গুনাহ ও গোমরাহী বলা হয়েছে। এমন কাজের প্রবর্তককে বিদ্‌আতী গোমরাহ ও গুনাহ্‌গার বলা যাবে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত বলে আখ্যায়িত করা যাবে। অধিকন্তু যে সব লোক এই নূতন কথার আবিষ্কারকের (আশ্রাফ আলী) কথার উপর আমল করবে ও মানবে তারাই বিদ্‌আতী হবে এবং গুনাহ্‌গার বলে সাব্যস্থ হবে।

বিদ্‌আতের সংজ্ঞা আল্লামা আইনী এভাবে দিয়েছেন ঃ

اِنْ كَانَتْ تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ قَبِيْحَةٌ (عَيْنِىْ شَرْحِ بُخَارِىْ)

অর্থ : বিদ্‌আত বা নব প্রবর্তিত নিয়ম পদ্ধতি যদি শরীয়ত সম্মত উত্তম কাজের পর্যায়ভূক্ত হয়, তা হলে তাকে বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদ্‌আত বলা হয়। আর যদি তা শরীয়ত বিরোধী খারাপ কাজের পর্যায়ভূক্ত হয়, তাহলে তাকে বিদ্‌আতে সাইয়েআ বলা হয় (আইনী)। বিদ্‌আত পাঁচ প্রকার। যথা-- ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ্‌, মকরুহ ও হারাম।

ইমাম ইজজুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম সীরাতে শামী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

تُعْرَضُ الْبِدْعَةُ عَلَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ فَاذَا دَخَلَ فِى الْاِيْجَابِ فَهِىَ وَاجِبَةٌ اَوْ فِىْ قَوَاعِدِ التَّحْرِيْمِ فَهِىَ مُحَرَّمَةٌ اَوِ الْمَنْدُوْبِ فَمَنْدُوْبَةٌ اَوِ الْمَكْرُوْهِ فَمَكْرُوْهَةٌ اَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ –

অর্থ : বিদ্‌আতকে শরীয়তের নীতিমালার খাপে যাচাই করতে হবে। যদি তা শরীয়তের ওয়াজিবের নীতিমালার অধীন হয়, তা হলে বিদ্‌আতে ওয়াজিবা হবে। (যেমন : ইলমে নাহ্‌, ইলমে ফিকাহ্‌, ইলমে কালাম ইত্যাদি)। আর যদি তা শরীয়তের হারামের নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে বিদ্‌আতে হারাম হবে। (যেমন : বাতিল পন্থী ও বাতিল আকিদা)। আর যদি তা মোস্তাহাব নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে বিদ্‌আতে মোস্তাহাব হবে। (যেমন : মিলাদের কেয়াম)। আর যদি শরীয়তের মকরুহ্‌ নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে ঐ নূতন কাজটি বিদ্‌আতে মকরুহ্‌ রূপে গণ্য হবে। (যেমন : কারোও মতে মসজিদে নকসা করা)। আর যদি ঐ নূতন কাজটি শরীয়তের মোবাহ্‌ নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে বিদ্‌আতে মোবাহ্‌ হবে। (যেমন : উত্তম খানা পিনা ও পোষাক)।

বিদ্‌আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করে শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্‌লভী (রহঃ) মিশকাত শরীফের শরাহ্‌ আশিআতুল লোমআত গ্রন্থে লিখেন :

بدانکه ہرچیز پیدا شود بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدعت ست و انچه موافق اصول وقواعد سنت ست وقیاس کرده شده است برآں آنرا بدعت حسنه گویند وانچه مخالف آں باشد بدعت ضلاله خوانند - کلیه "کل بدعة ضلالة" محمول بریں ست - وبعض بدعتها ست که واجب ست

چنانکه تعلیم وتعلم صرف و نحو که بداں معرفت آیات واحادیث گردد - وحفظ غرائب کتاب ودیگر چیزہا که حفظ دین وملت براں موقوف بود - وبعض مستحسن ومستحب مثل بناء رباطها ومدرسها - وبعض مکروه مانند نقش ونگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض - وبعض مباح مثل فراخی درطعامهائے لذیذه ولباسهاے مفاخره بشرطیکه حلال باشند وباعث طغیانی وتکبر ومفاخرت نشوند ومباحات دیگرکه در زمان آنحضرت صلے الله وسلم نبود - چنانکه بیری وغربال ومانند آں - وبعض حرام چنانکه مذاهب اہل بدع وہوا برخلاف اهل سنت وجماعت- وانچه خلفاے راشدین کرده باشند اگر چه بآں معنی که در زمان آنحضرت صلی الله علیه وسلم نبود بدعت ست لیکن از قسم بدعت حسنه خواہد بود - بلکه در حقیقت سنت است زیرا که آنحضرت صلی الله تعالی علیه وسلم فرموده اند برشما لازم گیرید سنت مرا وسنت خلفاء راشدین را رضوان الله تعالی علیهم اجمعین انتهے ا-

অর্থ : জেনে রাখো, যে কাজ বা জিনিস পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরে প্রবর্তিত হয়েছে, তাকেই বিদআত বলা হয়। কিন্তু যে কাজ সুন্নাতের কাওয়ায়েদ ও নীতিমালা অনুযায়ী হবে এবং ঐ নীতিমালার উপর কিয়াস করে করা হবে, সে

কাজকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। আর যে সব কাজ সুন্নাতের নীতিমালার পরিপন্থী হবে, তাকে বিদআতে দালালা বা সাইয়েআ বলা হয়। নবী করিম (দঃ) এর বানী-- "কুল্লু বিদআতিন দালালাতুন" সকল বিদ্আত-ই গোমরাহী- এই নীতিবাক্যটি দ্বিতীয় প্রকারের বিদআতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য- প্রথম প্রকারের বেলায় নয়। কোন কোন বিদআত এমন আছে যে, ঐ গুলো ওয়াজিব পর্যায়ভুক্ত। যেমন ঃ নাহ্ সরফের শিক্ষা দান করা ও শিক্ষা গ্রহন করা ওয়াজিব। কেননা নাহ সরফের মাধ্যমেই কোরআন ও হাদীসের সঠিক অর্থ বের করা যায় এবং আল্লাহর কিতাবের অতি সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও অন্যান্য জিনিসের ব্যাখ্যা সংরক্ষন করা যায়- যে গুলোর উপর দ্বীন ও মিল্লাতের হেফাজত নির্ভরশীল। আবার কোন কোন বিদ্আত মোস্তাহ্সান ও মোস্তাহাব। যেমন ঃ খানকা ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা মোস্তাহাব। কোন কোন বিদ্আত মাক্রুহ্। যেমন ঃ কারও কারও মতে মসজিদ ও কোরআন মজিদে নকশা করা মাকরুহ। কোন কোন বিদ্আত শুধু মোবাহ বা বৈধ। যেমন ঃ উত্তম খানা ও উত্তম পোষাকের প্রাচুর্যতা। তবে শর্ত হলো- হালাল হওয়া চাই এবং অহংকার-গৌরব ইত্যাদি বর্জিত হওয়া চাই। এমন সব অন্যান্য মোবাহ- যেগুলো নবী করিম (দঃ) এর যুগে ছিলনা সেগুলোও বিদ্আতে মোবাহ্র অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ পোলাও বিরয়ানী। কোন কোন বিদ্আত হারাম। যেমনঃ বিদ্আতী ফের্কার আকায়েদসমূহ যা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের পরিপন্থী। (যেমন রাসুলের নূর, ইলমে গায়ব, হাজির নাজির, শাফায়াত, নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া অস্বীকার করা ইত্যাদি -লেখক)। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত কাজসমূহ যা নবী করিম (দঃ) এর যুগে ছিলনা- সেগুলোও শাব্দিক অর্থে বিদ্আতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিদ্আতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্আতে হাসানা মূলতঃ সুন্নাতেরই অংশ। কেননা নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত সুন্নাতকে তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে।" (মিশকাত)।

(এই হাদীসে হুজুর (দঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত কাজকে সুন্নাত বলেছেন-যদিও তা নামে বিদ্আতের অন্তর্ভুক্ত)। শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) কর্তৃক বিদ্আতের এই সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিন্যাস স্বরণ রাখার যোগ্য। কেননা ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমগণ " কুল্লু বিদ্আতিন দালালাতুন" হাদীস খানার অপব্যাখ্যা করে নব প্রবর্তিত প্রত্যেক কাজকেই বিদ্আতে সাইয়েয়াহ্ বলে তাকে হারাম ঘোষণা করে এবং আমলকারীকে গুনাহ্গার, দোজখী, বিদ্বআতী ইত্যাদি বলে গালাগাল দিয়ে থাকে। জনগণকে তারা উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা করেই ধোঁকা দিয়ে থাকে। শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যাই সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। ওহাবীরা ধোকাবাজ। তারা "মান্ ছান্না ছুন্নাতান্ হাছানাতান্" হাদীসকে গোপন করে।

বিঃ দ্রঃ বিদআত দুই ধরনের। যথাঃ (১) হাসানা বা উত্তম (২) সাইয়েয়াহ বা মন্দ। কোন্ কোন্ বিদআত গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ কোন্ বিদআত পরিত্যাজ্য-সে সম্পর্কে হাদীস শরীফে পরিষ্কারভাবে নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

গ্রহণযোগ্য বিদআত সম্পর্কে হাদীস ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً فِى الْإِسْلَامِ فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ (مُسْلِمْ)

অর্থ ঃ নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম পন্থা উদ্ভাবন করবে, সে উদ্ভাবনের প্রতিদান তো পাবেই ঃ উপরন্তু তার অনুসরণে যারা ঐ কাজ করবে, তাদের সমান সওয়াবও সে পাবে। কিন্তু অনুসরণকারীগণের সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কমবে না। (মুসলিম শরীফ) কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সমর্থিত উক্ত নূতন প্রথা হতে হবে।

مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ (اَلْحَدِيْثْ)

অর্থ ঃ মুসলমান সর্বসাধারণ যে কাজকে সতঃস্ফূর্তভাবে ভাল জ্ঞান করে, তা আল্লাহর নিকটও ভাল (আল হাদীস)

সুতরাং কোরান সুন্নাহর আলোকে পরে সংযোজিত ও মুসলমানগণ কর্তৃক উত্তম বিবেচিত কাজ বিদ্আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পরিত্যাজ্য বিদআত সম্পর্কে হাদীসঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ- كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (اَلْحَدِيْثْ)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মের মধ্যে এমন কাজ প্রচলন করবে যা উহাতে নেই, তা বাতিল"। "প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত অসমর্থিত কাজই বিদআত এবং প্রত্যেক অসমর্থিত বিদআত গোমরাহী"।

কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী সকল নূতন কাজই পরিত্যাজ্য বিদআত এবং এই হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়। শেখ দেহ্লভীর বর্ণিত সুত্রটি স্বরণ রাখতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুফর ও শিরক প্রসঙ্গ এবং থানবী সাহেবের ফিরিস্তি

বেহেস্তী জেওর ঃ

كفر و شرك كى باتوں كا بيان

"কুফরী ও শিরকী কাজের বর্ণনা"

সংশোধন ঃ

আশরাফ আলী থানবী সাহেব কুফর ও শিরক অধ্যায়ে বেহেস্তী জেওর ১ম খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠায় অনেকগুলো কাজকে কুফর ও শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন ঃ

১) কারও নামে নজর নেয়াজ দেওয়া।

২) কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, মকসুদ পূরণের জন্য প্রার্থনা করা, রিজিক ও সন্তান চাওয়া ইত্যাদি।

৩) কারও নামে পশু জবাই করা।

৪) সাহায্যের উদ্দেশ্যে কাউকে ডাকা।

৫) কাউকে কল্যাণ বা অকল্যাণকারী মনে করা এবং মন-মকসুদ পূরণকারী বলে বিশ্বাস করা।

৬) কোন স্থানের আদব ও সম্মান করা।

৭। আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা। ---- ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশরাফ আলী থানবী উপরোক্ত বিষয়গুলোকে ইসমাইল দেহলভীর অনুকরণে শিরক ও কুফর সাব্যস্থ করেছেন। বরং ইসমাইল দেহলভীর কথাগুলোকেই তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে শব্দ পরিবর্তন করে বেহেস্তী জেওরে লিখেছেন। অথচ এগুলো কখনও শিরক বা কুফর নয়। সংশোধনের লক্ষ্যে ইসমাইল দেহলভীর লিখিত "তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান" -- এ বর্ণিত কুফর ও শিরকের বিস্তারিত বর্ণনার অনুবাদ আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহলেই দেখা যাবে- আশরাফ আলী থানবী সাহেব অন্ধভাবে ইসমাইল দেহলভীকে কিভাবে অনুকরণ করেছেন এবং বেহেস্তী জেওর কিতাবখানা যে তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানেরই সংক্ষিপ্ত সার, তাও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

তৃতীয় অধ্যায়

"তাকভিয়াতুল ঈমানের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুবাদ ঃ

তাকভিয়াতুল ঈমান ৪র্থ পৃষ্ঠা প্রথম অধ্যায় তৌহিদ ও শিরক-এর বর্ণনা ঃ

ইসমাইল দেহলভী বলেন, "জেনে রাখা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ লোকই পীরগণকে, পয়গাম্বরগণকে, ধর্মের ইমামগণকে, শহীদগণকে, ফিরিস্তাগণকে, জ্বীন পরীগণকে বিপদের সময় ডেকে থাকে। তাঁদের নিকট মকসুদ পূরণের দোয়া করে থাকে। তাঁদের নামে মান্নত করে থাকে। মকসুদ পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁদের নামে নজর-নেয়াজ দিয়ে থাকে। বিপদ দূর করার উদ্দেশ্যে আপন ছেলেদের নাম তাঁদের সাথে সম্পর্কীত করে। যেমন কেউ ছেলের নাম রাখে আবদুন নবী অথবা আলী বখ্‌শ অথবা গোলাম মহিউদ্দীন অথবা গোলাম মঈনুদ্দীন। ছেলেদের বেঁচে থাকার জন্য মহৎ ব্যক্তিগণের নামে ছেলেদের মাথায় টিকি রাখে। কারোও নামের বস্ত্র পরিধান করায়। কেউ কেউ কোন কোন মহৎ ব্যক্তির নামে পশু ছেড়ে দেয়। বিপদের সময় কারোও নামের দোহাই দেয়া হয়। কারও কারও নামে কসম করা হয়। মূল কথা ঃ হিন্দুরা দেব-দেবীর নামে যা করে, এই তথাকথিত নামধারী মুসলমানেরাও নবী, অলী, ইমাম, শহীদ, ফিরিস্তা ও জ্বীন-পরীদের নামে অনুরূপ কাজই করে থাকে। এরা আবার মুসলমান বলেও দাবী করে। কিন্তু আশ্চর্য! এই মুখে এই দাবী? আল্লাহ সাহেব যথার্থই বলেছেনঃ "অধিকাংশ লোকই নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা মুশরিক"। (নাউজু বিল্লাহ)

তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার বর্ণনার অনুবাদ ঃ

"অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা বরাবর মনে করাই কেবল শিরক নয়। বরং শিরক-এর অর্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য যা খাস করেছেন এবং বান্দার জন্য বন্দেগীর প্রতীক বা চিহ্ন হিসাবে যা ঠিক করেছেন, সেসব কাজ অন্যের জন্য করাও শিরক। যেমনঃ অন্য কাউকে সিজ্‌দা করা, কারোও নামে জানোয়ার পালন করা, মান্নত করা, বিপদে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া, সর্বত্র অন্যকে হাজির-নাজির মনে করা, অন্য কারো ক্ষেত্রে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি প্রমাণ করা ইত্যাদি --। উল্লেখিত এসব বিশ্বাস বা কাজ সবই শিরক। এক্ষেত্রে আম্বিয়া, আউলিয়া, জ্বীন-শয়তান, ভূত-প্রেত-এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। অর্থাৎ যার ব্যাপারেই উক্ত আকিদা পোষণ করবে, মুশরিক হয়ে যাবে। চাই নবীর বেলায় হোক আর পীর অলীদের ব্যাপারেই হোক"। (নাউজু বিল্লাহ)

তাকভিয়াতুল ঈমানের ৭ম পৃষ্ঠার বর্ণনাঃ

"যে কোন লোক কারোও নাম উঠতে বসতে উচ্চারণ করে এবং দূর বা নিকট থেকে তাঁকে ডাকে। বালা মুসিবতের বিরুদ্ধে তাঁর দোহাই দেয় কিংবা তাঁর নাম নিয়ে শত্রুর উপর হামলা চালায়। কিংবা তাঁর নামে খতম পড়ে অথবা তাঁর নাম জপতে থাকে। কিংবা তাঁর আকৃতি বা চেহারার খেয়াল করে। উপরোক্ত সব কারণেই ঐ ব্যক্তি

মুশরিক হয়ে যাবে। এসব কথা বা আকিদার সবগুলোই শিরক। এসব আকিদার কারণে সে অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" (নাউজু বিল্লাহ)

উল্লেখিত পৃষ্ঠায় আরও বর্ণিত আছেঃ

"সৃষ্টিজগতে শক্তি প্রয়োগ করা, কারও বিরুদ্ধে জয়লাভ করা কিংবা পরাজয় বরণ করা, কারও মক্‌সুদ পূরণ করা, বালা মুসিবত দূর করা, বিপদে সাহায্য করা– এসব কিছু আল্লাহরই কাজ। কোন নবী, অলী, পীর, শহীদ বা ভূত-পেত্নীর এ ক্ষমতা নেই। কারও জন্য এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি প্রমাণ করে তাঁর কাছে মনোবাঞ্ছা পূরণের সাহায্য প্রার্থনা করা এবং এই আশায় তাঁর নামে নজর নেয়াজ দেয়া বা তাঁর নামে মান্নত করা ও বিপদের সময় তাঁর সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি কারণে ঐ ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যাবে। এমন কি যদি সে মনে করে যে, এ ক্ষমতা তাঁর নিজস্ব অথবা যদি মনে করে যে, আল্লাহ তাঁকে এ ক্ষমতা দান করেছেন– সর্বাবস্থায়ই শির্‌ক হবে।" (নাউজু বিল্লাহ)

তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের ৮ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"কেউ যদি কোন নবী, অলী, পীর, ভূত-পরী অথবা সত্য-মিথ্যা কবর, আসন, চিল্লা, স্থান, তাবারুক, নিদর্শন অথবা বাক্সকে সিজ্‌দা করে কিংবা রুকু করে, অথবা ঐগুলোর নামে রোজা রাখে, অথবা তাঁদের বা ঐগুলোর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ায় অথবা জানোয়ার জবেহ্‌ করে, অথবা দূর থেকে মনস্থ করে ঐ সব স্থানে গমন করে, অথবা ঐ সব স্থানে আলোক সজ্জা করে, গিলাফ চড়ায়, চাদর দিয়ে ঢাকে, কিংবা বিদায়কালে উল্টো পায়ে চলে, তাঁদের কবরকে চুম্বন করে, ঐ স্থানে মশাল জ্বালায়, তাঁদের কবরের উপর শামিয়ানা লটকায়, চৌকাঠকে চুম্বন করে, হাত বেঁধে প্রার্থনা করে, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে, অথবা ঐ স্থানে প্রতিবেশী সেজে বসে থাকে, ঐ স্থানের জলা-জঙ্গলের সম্মান করে এবং এরূপ অন্যান্য কাজ-কর্ম করে– তাহলে তাঁর বেলায় শিরক প্রমাণিত হবে। কেননা এসব কাজ আল্লাহ্‌ তায়ালা আপন বন্দেগী ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে করার জন্যই বান্দাকে নির্দেশ করেছেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ৯ম পৃষ্ঠার বর্ণনাঃ

"কোন ব্যক্তি যদি আম্বিয়া, আউলিয়া, ইমাম, শহীদ, জ্বীন-পরীর ঐ প্রকার সম্মান ও তাজীম প্রদর্শন করে। যেমনঃ সঙ্কটপূর্ণ কাজে তাঁদের নামে মান্নত করে। বিপদে পড়ে তাঁদেরকে ডাকে। সন্তান হলে তাঁদের নামে নজর-নেয়াজ দেয়া হয়। আপন সন্তানের নাম আবদুন নবী, ইমাম বখ্‌শ, পীর বখ্‌শ রাখে। তাঁদের নামে জানোয়ার মান্নত করে। তাঁদেরকে ভক্তি করে। অথবা একথা বলে-যদি আল্লাহ ও রাসুল ইচ্ছ করেন, তাহলে এ কাজটি হয়ে যাবে। আর শপথ করার প্রয়োজন হলে পয়গাম্বরের, অলীর, কোন ইমামের, কোন পীরের অথবা তাঁদের কবরের শপথ করে, তবে উপরোক্ত সব ক্ষেত্রেই শিরক হবে। কেননা এ প্রকারের কাজ আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজের তাজীমের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের ২৮ পৃষ্ঠার বর্ণনাঃ

"ইবাদতের মধ্যে শিরক্‌-এর বর্ণনাঃ কোন কবর, চিল্লার স্থান বা আসনের উদ্দেশ্যে সফরের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে ধূলায় ধূসরিত হয়ে তথায় পৌছা এবং সেখানে গিয়ে পশু নেয়াজ দেয়া ও মান্নত পূর্ণ করা, কিংবা কোন কবর বা স্থানের চতুস্পার্শে চককর দেয়া ও তাওয়াফ করা, আশে পাশের বন-জঙ্গলের তাজীম করা, তথায় শিকার না করা, গাছ কর্তন না করা, ঘাস না ছিড়া এবং অনুরূপ কার্য-কলাপ না করা, এসব কাজের মাধ্যমে দ্বীন-দুনিয়ার উপকারের আশা পোষণ করা- ইত্যাদি শিরক"। (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ আছেঃ

কোরআনের পবিত্র আয়াত-"ওয়ামা উহিল্লা বিহী লিগাইরিল্লাহ" অর্থাৎ "যে সব পশু গাইরুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে জবাই করা হয় তা হারাম"-এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে কোন সৃষ্টির নামে পশু নির্ধারণ করা যাবেনা। ঐ পশু খাওয়া হারাম ও নাপাক। উক্ত আয়াতে একথার উল্লেখ নেই যে, জবাই করার সময় কারও নাম নিলে হারাম হবে। বরং একথার উল্লেখ আছে যে, কোন সৃষ্টির নামে কোন পশু এভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, ঐ গরুটি সাইয়েদ আহমদ কবির (রহঃ) এর, অথবা এ ছাগলটি শাইখ সাদ্দাদ (রহঃ)-এর নামে। তাহলেই উক্ত পশুটি হারাম হয়ে যাবে। (আরব দেশের দুই বিখ্যাত অলীর নাম- অনুবাদক)। আর কোন পশু হোক কিংবা মুরগী হোক কিংবা উট হোক, কোন সৃষ্টির নামে দিলে, চাই তিনি অলী হোন কিংবা নবী, বাপ হোক বা দাদা হোক, ভূত হোক বা পরী হোক, সবই হারাম ও নাপাক হবে। যিনি একাজ করবেন-তিনিই মুশ্‌রিক হিসাবে গণ্য হবেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যার সাধ হয় ধ্বংস হওয়ার .... " উক্ত হাদীসের মর্মে বুঝা যায় যে, শুধু সম্মানের উদ্দেশ্যে কারও সম্মুখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা ঐসব কাজের পর্যায়ভুক্ত- যেগুলোকে আল্লাহ নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য তা করা যাবে না।" (নাউজু বিল্লাহ)

উল্লেখিত কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছেঃ

"লাআনাল্লাহু" শীর্ষক হাদীসের মর্মে বুঝা যায় যে, কারও নামে পশু পালন করাও ঐসব কাজের অন্তর্ভুক্ত- যেগুলোকে আল্লাহ্‌ খাস করে নিজের তাজীমের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তাঁর নামেই একাজ করা উচিত। অন্য কারও জন্য করা শিরক"। (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"আল্‌ আক্‌ওয়ামু" শীর্ষক হাদীসের মর্মে বুঝা যায় যে, আল্লাহর ঘর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা স্থানের তাওয়াফ করা বা চতুর্দিকে চক্কর দেয়া শিরক।" (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"লাতাকুলু মা-শাআল্লাহ" শীর্ষক হাদীস মর্মে বুঝা যায় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই সব কিছু হয়। ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌রই শান। এর মধ্যে অন্য কারও দখল নেই। সুতরাং আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টির নাম যোগ করা যাবে না, তিনি যত বড়ই হোন না কেন এবং যত বড় সান্নিধ্য প্রাপ্তই হোন না কেন। উদাহরণ স্বরূপঃ একথা বলা যাবেনা যে, "আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসুল চাইলে অমুক কাজটি হয়ে যাবে"। কেননা, সমস্ত কাজ কারবার আল্লাহর ইচ্ছায়ই সমাধা হয়। রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। অথবা কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে, অমুকের অন্তরে কি আছে? এর উত্তরে একথা বলা জায়েজ হবেনা যে, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই জানেন"। কেননা গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। রাসুল গায়েবের কথা কিভাবে বল্‌বেন?" (নাউজু বিল্লাহ)

তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের ১৭ পৃষ্ঠায় আছেঃ

শির্‌ক ফিল ইল্‌ম অধ্যায়ঃ

"ওয়ামান আদাল্লু মিম্‌মান" শীর্ষক আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, এই যে লোকেরা দূর হতে পূর্ববর্তী বুজুর্গগণকে ডাক দেয় এবং একথা বলে যে, হে হযরত! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন-যেন তিনি আপন কুদরতে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দেন। এই ধরনের চাওয়ার দ্বারা যদিও সরাসরি শির্‌ক প্রমাণিত হয়না, তবুও ডাকার ধরনে প্রমাণিত হয় যে, ঐ বুজর্গ ব্যক্তি দূর বা নিকট থেকে তার ডাক শুন্‌ছেন। এ বিশ্বাস নিয়েই লোকেরা ঐ বুজর্গ ব্যক্তিকে ডেকে থাকেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"ফালা তাদ্‌উ মাআল্লাহি আহাদা" শীর্ষক আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আদবের সাথে অন্য কোন বুজর্গ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, তাঁকে ডাকা কিংবা তাঁর নাম জপন করা ঐসব কাজের পর্যায়ভুক্ত- যেগুলোকে আল্লাহ সাহেব নিজের তাজীমের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেছেন। অন্য কারও সাথে এধরনের আচরণ করা শিরক"। (নাউজু বিল্লাহ)

আশ্‌রাফ আলী থানবী সাহেব **ইসমাইল** দেহ্‌লভীর তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের উপরোক্ত এবারতগুলোকেই সংক্ষিপ্ত করে ভিন্ন ভাষায় বেহেস্তী জেওরে লিখেছেন এবং এগুলোকে শিরক ও কুফর বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো শিরক বা কুফর নয়। কেননা যত বড় জাহেল ও মূর্খ লোকই হোক্‌না কেন, কোন মুসলমানই নবী ও অলীগণকে মাবুদ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা কিংবা অবিনশ্বর বলে মনে করে ঐসব কাজ করেনা- যেগুলোকে আশরাফ আলী থানবী শিরক ও কুফর বলেছেন। কোন মুসলমানের ঈমানই এ কথার স্বীকৃতি দেয় না। আর দেয় না বলেই এগুলোকে শিরক ও কুফর বলা মূর্খতা, ঔদ্যত্ব ও নিশ্চিত হারামেরই পরিচায়ক এবং মুসলমানদের উপর বদগুমানী মাত্র। তিনি (আশরাফ আলী সাহেব) কি করে বুঝলেন যে, মুসলমানগণ অন্যকে খোদা মনে করে, কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ও অবিনশ্বর বলে মনে করে, বাসনা পূরণকারী ও হাকীকী ক্ষমতা

প্রয়োগকারী বলে বিশ্বাস করে এবং এসব কাজ করে? তিনি কি মানুষের কলব ফাঁক করে দেখেছেন? তাঁর কাছে কি কোন ইলহাম বা ওহী এসেছে? অথবা তিনি কি ইল্‌মে গায়েবের মাধ্যমে জেনেছেন? অন্যের জন্য ইল্‌মে গায়েব মানা তো তাঁর মতেই শিরক।

আল্লাহ তায়ালা তো পরিষ্কারভাবেই কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থ ঃ "যে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত নও, সে ব্যাপারের পিছনে লেগে যেরোনা"।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهٖ حَتّٰى تَعْلَمَ اَقَالَهَا اَمْ لَا

অর্থ ঃ "তুমি তার অন্তর ছেদ করে কেন দেখনি যে, সে সত্যিই একথা বলেছে অথবা বলেনি? মনের কথা তুমি কি করে জান্‌লে?"

আশরাফ আলী থানবী সাহেব মুসলমানের মনের খবর সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই শুধু অনুমানের ভিত্তিতে তাঁদেরকে কাফের ও মুশরিক বলে আখ্যায়িত করে আল্লাহর কালাম ও রাসুলের হাদীসকে সঙ্কটে ফেলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ط اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ *

অর্থ ঃ "হে মুমেনগণ! অনুমানভিত্তিক কথা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কোন কোন অনুমানভিত্তিক কথা মস্তবড় গুনাহ্।"

আল্লাহর এ সম্বোধন তো ঈমানদারেরাই শুনবে এবং নির্দেশ মান্য করবে। এর সাথে বেঈমানদের কিসের সম্পর্ক?

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ + رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ-

অর্থ ঃ অনুমান করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা অনুমান করে কথা বলা সবচেয়ে বড়

আরেফ বিল্লাহ হযরত আহমদ জারুক (রহঃ) সত্যিই বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَنْشَأُ الظَّنُّ الْخَبِيْثُ عَنِ الْقَلْبِ الْخَبِيْثِ + نَقَلَهُ سَيِّدِىْ عَبْدُ الْغَنِىْ نَابُلُسِىُّ فِىْ شَرْحِ الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ *

অর্থঃ "বদ্‌গুমানী খবিশ অন্তর থেকেই সৃষ্টি হয়" (শরহে তরিকায়ে মোহাম্মাদীয়া কৃত আল্লামা আবদুল গনি নাব্‌লুসী ফিলিস্তিনী)।

ফতোয়ায়ে রেজভিয়া কিতাবুল খতর ওয়াল ইবাহাত অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ

آدمی حقیقةً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک کہ غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نہ جانے - بعض نصوص میں بعض افعال پر اطلاق شرک تغلیظا یاتشبیہا یا بارادہ مقارنت باعتقاد مُنافی توحید وَاَمْثَال ذٰلِكَ مِنَ التَّاوِيْلَاتِ الْمَعْرُوْفَةِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَارِدْ ہوا ہے جیسے کفرنہیں - مگر ضروریات دین اگرچہ ایسی ہی تاویلات سے بعض اعمال پر اطلاق کفر آیا ہے یہاں ہر گز عَلَى الْاِطْلَاقِ شِرْكٌ وَكُفْرٌ مُصْطَلَحَهٌ عقائد کہ آدمی کو اسلام سے خارج کریں اور بے توبہ قطعا مغفور نہ ہوں زنہار مراد نہی کہ عقیدہٗ اجماعیہ اہل سنت کے خلاف ہے ہر شرک کفر ہے مُزِیل اسلام- اور اہل سنت کا اجماع ہے کہ مؤمن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے - ایسی جگہ نصوص کو عَلَى الْاِطْلَاقْ کفر وشرک مُصْطَلَحَهْ پر حمل کرنا

اشقیاء خوارج کامذہب مطرود ہے اور شرک اصغر ٹھراکر پھر قطعا مثل شرک حقیقی غیر مغفور ماننا وھابیہ نجدیہ کا خبط مردود - وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى كُلِّ عُنُوْدٍ *

অর্থঃ "মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা ও অবিনশ্বর মনে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃতপক্ষে কোন কথার দ্বারা মুশরিক সাব্যস্থ হবেনা। কোন কোন ইবারতে কোন কোন কাজকে শিরক বলা হয়েছে শুধুমাত্র শাসানোর জন্য অথবা শিরকের সাথে বাহ্যিক সামঞ্জস্যের কারণে, অথবা তাওহীদ পরিপন্থী কাজের সাথে সম্পৃক্ততার খেয়ালে। অনুরূপ কার্যকলাপ নামে শিরক হলেও ওলামাগণের মতে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় বিধায় সেগুলো কুফর হবে না। কিন্তু ধর্মের মৌলিক বিষয়ে হলে তা অবশ্যই কুফর হবে। কোন কোন কাজে বা কথায় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ শাব্দিক কুফর সাব্যস্থ করা হলেও আকায়েদের পরিভাষায় এগুলোকে ঢালাওভাবে শিরক বা কুফর বলা যাবেনা। কেননা শিরক ও কুফর হলে মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ বলতে হবে এবং বিনা তৌবায় তা ক্ষমার অযোগ্য বল্‌তে হবে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়গুলো (নস বা বর্ণনায় উল্লেখিত) পারিভাষিক শিরক ও কুফরের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আহ্‌লে সুন্নাতের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত আকিদারও খেলাফ। বরং ঐসব বর্ণিত বিষয় কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। যদি শিরক হয়, তাহলে কুফর হবে। আর কুফর হলে ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে। আহ্‌লে সুন্নাতের ওলামাগণের ঐক্যমত হলো-কোন কবিরা গুনাহের কারণে কোন মুসলমানই ঈমান থেকে খারিজ হয়না। মুমিনদের ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে ঐসব কাজকে পারিভাষিক শিরক ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হতভাগ্য খারিজী সম্প্রদায়েরই মতবাদ- যা পরিত্যাজ্য। ঐগুলোকে প্রথমে ছোট শিরক সাব্যস্থ করে পুনরায় প্রকৃত শিরকের মত নিশ্চিতভাবে মনে করা এবং ক্ষমার অযোগ্য বলে সাব্যস্থ করা নজ্‌দী ওহাবীদের ধোকাপূর্ণ কাজ, যা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক হঠকারিতার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনীয়।" (ফতোয়ায়ে রেজভিয়া)।

শরহে আকায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

اَلْاِشْرَاكُ هُوَ اِثْبَاتُ الشَّرِيْكِ فِى الْاُلُوْهِيَّةِ بِمَعْنٰى وُجُوْبِ الْوُجُوْدِ كَمَا لِلْمَجُوْسِ وَبِمَعْنٰى اِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ *

অর্থঃ শিরক বলা হয় আল্লাহর উপাসনায় অন্যকে খোদার সাথে শরিক করা। যেমন, প্রতিমা পূজারীরা এরূপ বিশ্বাস করে থাকে। অথবা খোদার ন্যায় অন্যকেও ওয়াজিবুল উজুদ বা অবিনশ্বর বলে বিশ্বাস করা। যেমন, অগ্নি উপাসকগণ দুই সমান খোদাতে বিশ্বাসী। একজন ভাল-র সৃষ্টি কর্তা এবং অন্যজন মন্দের সৃষ্টিকর্তা।

অন্যদিকে কবিরা গুনাহের সংজ্ঞা ও হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আকায়েদ গ্রন্থের মূল এবারতে নিম্নরূপ লেখা আছেঃ

اَلْكَبِيْرَةُ لَاتُخْرِجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْاِيْمَانِ وَلَاتُدْ خِلُهُ فِي الْكُفْرِ *

অর্থ ঃ "কবিরা গুনাহের কারণে কোন মুমিন ঈমান থেকে খারিজ হয়ে কাফিরে পরিণত হয়না।"

(সুতরাং সমস্ত কবিরা গুনাহের কাজকে ঢালাওভাবে শিরক বা কুফর সাব্যস্থ করা মূর্খতা ও বেঈমানী ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব বেহেস্তী জেওরে উল্লেখিত (১) কারও নামে নজর নেয়াজ দেয়া। (২) কারও নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া, মকসুদ পূর্ণ করা ও রিজিক আওলাদ ইত্যাদি চাওয়া, (৩) কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়া বা জবেহ করা, (৪) কাউকে কল্যাণ অকল্যাণকারী,মনোবাঞ্ছা পূরণকারী মনে করা, (৫) কোন স্থানের আদব ও তাজীম করা, (৬) কারও নাম আবদুন্নবী রাখা– ইত্যাদিকে কুফর ও শিরক বলে ঢালাওভাবে ফতোয়া দেয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। (আশরাফ আলী থানবীর উক্ত বিষয়গুলোর পর্যালোচনা প্রাথমিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে ভূমিকা স্বরূপ গ্রন্থকার এখানে উল্লেখ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক আলোচানা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন পরবর্তীতে আস্‌ছে। – অনুবাদক)

চতুর্থ অধ্যায়

অলীগণের কাশ্‌ফ ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওর ঃ

کسی بزرگ یا پیرکے ساته یه عقیده رکهنا که همارے

سب حال کی اسکو ہر وقت خبر رہتی ہے (کفروشرك ہے)

অর্থঃ "কোন বুজুর্গ ব্যক্তি বা পীর সম্পর্কে এ আক্বিদা পোষণ করা যে, 'আমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে তিনি সব সময় অবগত আছেন-এরূপ আক্বিদা রাখা কুফর ও শিরক।" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ্ বা ভুল সংশোধন ঃ

হাঁ, বুজুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে উম্মতে সাইয়েদুল মোরসালীন (দঃ) সম্পর্কে ঐ রূপ আক্বিদা পোষণ করাই সঠিক। এরূপ বিশ্বাসকে কুফর ও শিরক বলা সরাসরি মূর্খতা ও ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। আহ্‌লে সুন্নাতের বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ বেহেস্তি জেওরে বর্ণিত উক্ত বদ আক্বিদার খন্ডন বহুবার করেছেন।

উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের গ্রন্থ সমূহে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব ও প্রিয় বান্দাদেরকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, যখন তাঁরা শারিরীক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং খোদার নৈকট্য লাভ করেন, তখন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা থাকেনা। সমগ্র সৃষ্টি জগতে যা কিছু ঘটে, তাঁরা সেগুলোকে নিকটের বস্তুর মতই দেখেন ও শোনেন। সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তুর ঘটনা তাঁরা আকাশে বর্ণনা করেন। পৃথিবীর মাশরিক মাগরিব-তথা এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যথা ইচ্ছা গমনাগমন করতে পারেন।

১নং দলীল ঃ

এ সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরক্বাতে এবং আল্লামা মানাভী (রহঃ) তাইসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"اَلنُّفُوْسُ الْقُدْسِيَّةُ اِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ

اِتَّصَلَتْ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حِجَابٌ فَتَرٰى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ

অর্থ ঃ "পবিত্রাত্মাগণ যখন শারিরীক বন্ধন-মুক্ত হয়ে যান, তখন তাঁরা উর্দ্ধজগতের ফিরিস্তাদের সাথে মিশে যান। তখন তাঁদের জন্য আর কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকেনা। অতঃপর তাঁরা চাক্ষুস ব্যক্তির ন্যায় সব কিছুই দেখতে ও শুনতে পান।" (এতে প্রমাণিত হলো যে, অলী আল্লাহ্গণ সব সময় আমাদের অবস্থা দেখেন ও শোনেন। আর নবী করিম (দঃ) এর বেলায় তো না দেখা ও না শোনার প্রশ্নই উঠ্তে পারে না– অনুবাদক)

২নং দলীলঃ

ইব্‌রিজ শরীফে উল্লেখ আছেঃ

" اَلْعَارِفُ يَجْذُبُ اِلٰى حَيِّزِ الْحَقِّ فَيَصِيْرُ عِنْدَ اللّٰهِ فَيَتَجَلّٰى لَهٗ كُلُّ شَيْئٍ *

অর্থ ঃ "আরেফগণ সত্য পথ অতিক্রম করে খোদার নিকটে পৌছে যায় এবং তখন তাঁদের নিকট সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।"

৩নং দলীল ঃ

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) 'তাজ্‌কিরাতুল মাউতা' গ্রন্থে লেখেনঃ

"ارواح ایشاں از زمین وآسماں وبہشت ہر جاکہ خواہند میروند– ابن ابی الدنیا از مالك رض روایت نمود ارواح مؤمنین ہر جاکہ خواہند سیر کنند– مراد از مؤمنین کاملین اند –"

অর্থ ঃ "আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহ আসমান-জমিন ও বেহেস্ত- যে কোন স্থানে ইচ্ছা করেন যেতে পারেন। ইবনে আবিদ্ দুনিয়া হযরত মালেক (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ "মোমেনগণের রূহ যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন"। মোমেনীন অর্থে এখানে কামেল মোমেন বুঝান হয়েছে।"

মন্তব্য ঃ

কামেল মোমিনগণের যদি এ অবস্থা হয়, তা হলে খোদার প্রিয় বান্দা আউলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা তো আরও অনেক উর্দ্ধে হবে। সাধারণ কামেল মুমিনদের রূহকে আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তাঁরা দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত. আকাশে দনিয়ার সংবাদ বয়ান করেন এবং যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন।

৪নং দলিল ঃ

আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতি (রহঃ) শরহুস সুদূর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

قَالَ الْحَكِيْمُ التِّرْمِذِيُّ– اَلْاَرْوَاحُ تَجُوْلُ فِى الْبَرْزَخِ فَتَبْصُرُ اَحْوَالَ الدُّنْيَا وَاَحْوَالَ الْمَلَائِكَةِ تَتَحَدَّثُ فِى السَّمَاءِ عَنْ اَحْوَالِ الْاٰدَمِيِّيْنَ"

অর্থ ঃ "রূহ সমূহ আলমে বরজখে (দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী স্থানে) ভ্রমণ করে থাকে। দুনিয়ার যাবতীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং ফিরিস্তাগণকে পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করতেও দেখে"। (তিরমিজি)

৫নং দলীলঃ

ইমাম কাস্‌তুলানী (রহঃ) মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে, আল্লামা আবদুল বাকী জুরক্বানী (রহঃ) শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনুল হাজ্ (রহঃ) মাদ্‌খাল গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"مَنْ اِتَّصَلَ اِلٰى عَالَمِ الْبَرْزَخِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَعْلَمُ اَحْوَالَ الْاَحْيَاءِ غَالِبًا وَقَدْ وَقَعَ كَثِيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ كَمَا هُوَ مَسْطُوْرٌ فِىْ مَظَنَّةِ ذٰلِكَ مِنَ الْكُتُبِ *

অর্থ ঃ "যে মুসলমানগণ আলমে বরজখে (কবরে) আছেন, তাঁরা অধিকাংশ সময়ই জীবিত লোকদের অবস্থা জানেন। বাস্তবেও এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে অনেক কিতাবেই এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।"

৬নং দলীলঃ

আউলিয়ায়ে কেরামের শ্রবণ ও দর্শন শক্তি সম্পর্কে শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্‌লভী (রহঃ) মেশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যা 'আশিয়াতুল লুমআত' গ্রন্থে লিখেনঃ

"بالجملہ کتاب و سنت مملو ومشحون اند باخبار و آثار کہ دلالت میکنند بر وجود علم موتی بدنیا واہل آں – پس منکر نشود آنرا مگر جاہل باخبار ومنکر دین "–

অর্থ ঃ "দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তিগণের ইল্‌ম ও অবগতির বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে হাদীস ও রেওয়ায়াতে- অসংখ্য দলীল ভরপুর রয়েছে। অতএব হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ ও ধর্মের অস্বীকারকারীরাই কেবল ঐগুলোকে অস্বীকার করতে পারে।"

মন্তব্য ঃ

আমাদের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যখন পরিস্কারভাবে প্রমাণ করছেন যে, বুজুর্গানে দ্বীন দূর থেকে আমাদের অবস্থা দেখেন ও শোনেন, তখন তাঁদের সম্পর্কে আমাদের উক্ত আকিদা রাখা শুদ্ধ হবে না কেন? ঐগুলিকে কেবল মুনকেরে দ্বীন ও মূর্খ ব্যক্তিরাই শিরক ও কুফর মনে করে অস্বীকার করতে পারে- যেমন বলেছেন শেখ দেহ্‌লভী (রহঃ)। উপরে বর্ণিত দলীল দ্বারা ইন্‌তিকালপ্রাপ্ত অলী আল্লাহ্‌দের ইল্‌ম সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম। জীবিত অলীগণের ইল্‌ম সম্পর্কেও প্রমাণ রয়েছে যে, তাঁরাও দুনিয়ার যাবতীয় অবস্থা ও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কেও তাঁরা অবগত আছেন। প্রমাণস্বরূপঃ

৭নং দলীলঃ

ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান শাতনুফী (রহঃ) নিজ সনদে 'বাহ্‌জাতুল আসরার' (গাউসে পাকের জীবনী) গ্রন্থে লিখেনঃ

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"مَاتَطْلَعُ الشَّمْسُ حَتّٰى تُسَلِّمَ عَلَىَّ وَتَجِئُ السَّنَةُ اِلَىَّ وَتُسَلِّمُ عَلَىَّ وَتُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهَا وَيَجِئُ الشَّهْرُ وَيُسَلِّمُ عَلَىَّ وَيُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ وَيَجِئُ الْاُسْبُوْعُ وَيُسَلِّمُ عَلَىَّ وَيُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ وَيَجِئُ الْيَوْمُ وَيُسَلِّمُ عَلَىَّ وَيُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ وَعِزَّةِ رَبِّىْ اَنَّ السُّعَدَاءَ وَالْاَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُوْنَ عَلٰى عَيْنَىَّ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ- اَنَا غَائِصٌ فِىْ بِحَارِ عِلْمِ اللّٰهِ وَمُشَاهَدَتِهٖ *

অর্থ ঃ "সূর্য আমাকে সালাম না করে উদয় হয়না। নতুন বৎসর যখনই শুরু হয়, আমাকে সালাম জানায় এবং ঐ বৎসরের ঘটনাবলী আগাম জানিয়ে দেয়। নতুন মাস

ঘটনাবলী আমাকে জানায়। এমন কি-নূতন দিন আগমনের সাথে সাথে আমাকে সালাম জানায় এবং ঐ দিনের ঘটনাবলীও আমাকে জানায়। আমি আপন প্রতিপালকের শপথ করে বল্‌ছি- সমস্ত নেককার ও বদকার আমার দৃষ্টিতে পেশ করা হয়। আমার দৃষ্টি লাওহে মাহফুজের সাথে লাগা আছে। অর্থাৎ লাওহে মাহ্‌ফুজ আমার দৃষ্টির সীমানার মধ্যে। আমি আল্লাহর অসীম ইল্‌মের সাগরে ও মোশাহাদার (দিব্য-দর্শন) সমূদ্রে ডুবে রয়েছি।" (সুব্‌হানাল্লাহ্‌!)

মন্তব্য ঃ

লাওহে মাহ্‌ফুজের মধ্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার ছোট-বড় যাবতীয় বিষয় ও অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে কোরআন মজিদ সাক্ষ্য দিচ্ছে। অতএব যাঁর (গাউসে আজম) সম্মুখে লাওহে মাহফুজ রয়েছে এবং যিনি আল্লাহর অসীম ইল্‌ম ও ধ্যান-দর্শনের সমূদ্রে ডুবরীর ন্যায়। প্রতি বৎসর, মাস, সপ্তাহ-এমনকি প্রতিদিন যাঁকে সালাম জানায় এবং সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংবাদ অগ্রীম দিয়ে যায়,-তখন আমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সব সময় তাঁর অবগতি বিষয়ে কি সন্দেহ থাক্‌তে পারে? ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকদের এগুলোকে অস্বীকার করা ও কুফর শিরক বলা কেবলমাত্র হঠকারিতা ও আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে দুশ্‌মনি ছাড়া আর কিছুই নয়। লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। শয়তানের ধোকাবাজী থেকে আল্লাহর পানাহ্‌ চাই।

(উপরের দলীল প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল যে, আউলিয়ায়ে কেরাম-জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায়ই দুনিয়াবাসীর খবরা-খবর খোদা প্রদত্ত শক্তি বলে রাখেন। অলীদের এই শান হলে নবীজীর শান কি হতে পারে- তা বলার অপেক্ষা রাখেনা- (অনুবাদক)।

পঞ্চম অধ্যায়

দূর হতে আহবান করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওর ঃ

کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اسکو خبر ہوگئ (شرك وکفر ہے *

অর্থঃ "কাউকে দূর থেকে আহবান করা এবং তিনি অবগত হয়েছেন বলে বিশ্বাস করা কুফর ও শিরক" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ভুল খন্ডন ও সংশোধন ঃ

এত সংক্ষেপ করার কি প্রয়োজন ছিল? খোলাখোলিভাবেই তো লিখে দিতে পারতেন যে, আউলিয়ায়ে কেরামকে ডাকা, ইয়া আলী অথবা ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী বলে ডাকা অথবা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে নবী করিম (দঃ) কে সম্বোধন করা কুফর ও শিরক? যেমন অন্যান্য ওহাবী আলেমগণ পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামাগণ তা খন্ডন করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেনঃ "আউলিয়ায়ে কেরামকে ডাকা, ইয়া আলী, ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী, ইয়া রাসুলাল্লাহ ইত্যাদি বলে ডাকা- শিরক ও কুফর তো দূরের কথা, হারাম ও গুনাহ্‌ও নহে। নিঃশন্দেহে ঐরূপ বলা যায়েজ। বিভিন্ন হাদীস ও উলামায়ে কেরামের ফতোয়া অনুযায়ী ঐরূপ ডাকার প্রমাণ বিদ্যমান। প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১নং দলীলঃ

হাদীসঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا وَّاَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ هُنَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَايَرَاهُمْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ *

অর্থ ঃ "যখন তোমাদের কারও কোন জিনিস হারিয়ে যায় এবং সে এমন জায়গায় অবস্থান করে যেখানে কোন সাহায্যকারী ও সহযোগী না থাকে অথচ সাহায্যের

প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে যেন একথা বলে ডাকেঃ হে আল্লাহর (গোপন) বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহর (গোপন) বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করুন! কেননা, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন- যাঁকে সে দেখেনা।" (তাবরানী-হযরত উৎবা ইবনে গাজওয়ান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত)। সে গোপন বান্দা হচ্ছেন রিজালুল গায়ব বা গোপন অলী। তিনি হারানো বস্তু প্রাপ্তিতে সাহায্য করে থাকেন।

২নং দলীলঃ

হাদীসঃ অন্য বর্ণনামতে নবী করিম (দঃ) বলেছেন ঃ "যখন কারও কোন পশু জঙ্গলে বা বিরান ভূমিতে হারিয়ে যায়, তখন সে যেন এ কথা বলে সাহায্য চায় ঃ হে আল্লাহর গোপন বান্দাগণ! উহাকে আটক করুন! হে আল্লাহর গোপন বান্দাগণ! উহাকে আটকিয়ে রাখুন!" আল্লাহর বান্দাগণ উহাকে আটক করে দেবেন। (ইবনুস সুন্নী-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সূত্রে)।

দেখুন! স্বয়ং নবী করিম (দঃ) অলীগণকে ডাকার জন্য তালীম দিচ্ছেন এবং সাহায্য প্রার্থনার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন এবং এও বলে দিচ্ছেন যে, এ ডাক ঐ গোপন বান্দা শুনেন এবং সাহায্য করেন। অথচ বেহেস্তী জেওরের মতে উহা শিরক ও কুফর? (রাসুল (দঃ) কি শিরক শিক্ষা দিতে পারেন? কখনই নয়-অনুবাদক)।

৩নং দলীলঃ ফতোয়াঃ

সৈয়দ জামাল মক্কী কুদ্দিছা ছিররুহু নিজ ফতোয়া গ্রন্থে লিখেনঃ

"سُئِلْتُ عَمَّنْ يَّقُوْلُ فِى الشَّدَائِد يَارَسُوْلَ اللّٰه اَوْ يَا عَلِىُّ اَوْ يَاشَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ مَثَلاً هَلْ هُوَ جَائِزٌ شَرْعًا اَمْ لَا ؟ - فَاَجَبْتُ نَعَمْ اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالْاَوْلِيَاءِ وَنِدَاءُهُمْ وَالتَّوَسُّلُ بِهِمْ اَمْرٌ مَّشْرُوْعٌ وَشَيْئٌ مَّرْغُوْبٌ لَايُنْكِرُهُ اِلَّا مُكَابِرٌ اَوْ مُعَانِدٌ وَقَدْ حُرِمَ بَرَكَةَ الْاَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ الخ" *

অর্থ ঃ "আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে- কেউ বিপদে পড়ে সাহায্যার্থে ইয়া রাসুলাল্লাহ অথবা ইয়া আলী অথবা ইয়া শেখ আবদুল কাদের অথবা অনুরূপ নাম ধরে কাউকে ডাকা শরীয়ত মতে যায়েজ আছে কিনা? আমি (জামাল মক্কী) জবাবে ফতোয়া দিয়েছিঃ হাঁ! যায়েজ আছে। আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁদেরকে ডাক দেয়া, তাঁদের উছিলা ধরে আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়া- শুধু শরীয়ত সম্মত কাজই নয়;

বরং উত্তম কাজ। কোন অহঙ্কারী বা হিংসাকারী ব্যতিত কেউ এটাকে অস্বীকার করেনা। সে অবশ্যই আউলিয়ায়ে কেরামের বরকত লাভে বঞ্চিত।" (ফতোয়ায়ে সাইয়েদ জামাল মক্কী)

৪নং দলীলঃ ফতোয়া

ইমাম সিহাব রমলী (রহঃ) নিজ ফতোয়া গ্রন্থে লিখেনঃ

سُئِلَ بِمَا يَقَعُ مِنَ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَاشَيْخُ فُلَانُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ مِنَ الْاِسْتِغَاثَةِ بِالْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَهَلْ لِلْمَشَايِخِ اِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ اَمْ لَا * فَاَجَابَ اَنَّ الْاِسْتِغَاثَةَ بِالْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِيْنَ جَائِزَةٌ وَلِلْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ الخ

অর্থ : "শেখ সিহাব রমলী (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিপদ আপদকালে তারা– "হে অমুক শেখ" বলে এবং বুজুর্গ লোকদেরকে নাম নিয়ে ডাকে এবং নবী, রাসুল ও নেককার বান্দাদের নিকট ফরিয়াদ পেশ করে থাকে। শরীয়ত মোতাবেক এ কাজ যায়েজ আছে কিনা? অলী আল্লাহগণ ইনতিকালের পরেও সাহায্য করতে পারেন কিনা? এর উত্তরে ইমাম শেখ শিহাব রমলী বলেনঃ "নিশ্চয়ই নবী, রাসুল, অলী- আল্লাহ ও নেককার বান্দাদের নিকট, তাঁদের ইনতিকালের পরেও ফরিয়াদ করা যায়েজ এবং ইনতিকালের পরেও তাঁরা সাহায্য করতে পারেন।"

৫নং দলীলঃ ফতোয়াঃ

আল্লামা খাইরুদ্দিন রমলী (রহঃ) ফতোয়ায়ে রমলীতে বলেনঃ

"قَوْلُهُمْ يَاشَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ نِدَاءٌ * فَمَا الْمُوْجِبُ بِحُرْمَتِهِ *

অর্থ : "ইয়া শেখ আবদুল কাদের-বলার অর্থ হচ্ছে তাঁকে ডাকা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা। ইহা হারাম হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?"

৬নং দলীলঃ ফতোয়াঃ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)-এর লিখিত আল-ইন্‌তিবাহ্ ফি সালাসিলে আউলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

"শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব এবং তাঁর ওস্তাদ ও মাশায়েখগণ সর্বদা আপন আপন মুরিদ ও অন্যান্যভাবে উপকৃতদেরকে জাওয়াহিরে খামছা ও দোয়ায়ে সাহফী পাঠ করার অনুমতি প্রদান করতেন। ঐ সব অজিফার মধ্যে "নাদে আলী" নামক মশ্‌হুর অজিফাটি অন্যতম। উক্ত গ্রন্থে "নাদে আলী" অজিফা পাঠের নিয়ম এরূপ বলা হয়েছে ঃ সাত বার অথবা তিনবার অথবা একবার পাঠ করবে। অজিফাটি নিম্নরূপঃ

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ * تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِى النَّوَائِبِ *
كُلُّ هَمٍّ وَّغَمٍّ سَيَنْجَلِىْ * بِوِلَايَتِكَ يَاعَلِىُّ يَا عَلِىُّ يَاعَلِىُّ *

অর্থ ঃ "মুশ্‌কিল কুশা মাওলা আলী (কঃ) কে আহবান করো। তিনি অনেক রহস্যের প্রকাশস্থল। তুমি বিপদে–আপদে তাঁকে সাহায্যকারী হিসাবে পাবে। তুমি বলো- হে আলী! হে আলী! হে আলী! সর্ব প্রকার পেরেশানী ও চিন্তা আপনার বেলায়েতী শক্তিতে দূর হয়ে যাবে।"

থানবী সাহেবের মতে এবং অন্যান্য ওহাবী সম্প্রদায়ের মতে উক্ত অজিফা আদায়কারী কাফির ও মুশরিক। কেননা দূর হতে হযরত আলী (কঃ) কে তিনবার আহবান করা হয়েছে। কিন্তু পাক ভারতের বিখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব নিজ মুরিদদেরকে উক্ত অজিফা সাতবার, তিনবার অথবা একবার পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে থানবী সাহেবদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। আকাশের ঠাডা (বজ্র) যেন থানবী সাহেবের মাথায় এসে পড়েছে।

৭নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

শেখ নূরুদ্দীন আবুল হাসান শাত্‌নুফী (রহঃ) বাহ্‌জাতুল আস্‌রার গ্রন্থে হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর বাণী এরূপে লিখেছেনঃ

"مَنْ نَادَى بِاسْمِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ (بَهْجَةُ الْاَسْرَارِ)

অর্থ ঃ বিপদে পড়ে কেউ যদি আমার নাম ধরে ডাকে, ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী বলে সম্বোধন করে, তাহলে তার ঐ বিপদ দূর হয়ে যাবে। আরেক অর্থে - আমি তার বিপদ দূর করে দেবো।" (উক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হলো–হুজুর গাউসে পাক (রাঃ) দূরের ডাক শোনেন এবং সাহায্য করেন–অনুবাদক)।

৮নং দলীলঃ ঘটনাঃ

বিখ্যাত অলী হযরত মুহাম্মদ গামারী (রহঃ)-এর জনৈক মুরিদ বাজারে গমনকালে পা পিছলিয়ে পড়ে যান। তিনি হঠাৎ করে বলে উঠেনঃ

يَاسَيِّدِىْ مُحَمَّدُ يَاغَمَرِىْ

-ইয়া সাইয়েদী মুহাম্মদ ইয়া গামারী। ঐ পথেই ইব্‌নে আমর নামক জনৈক ব্যক্তিকে হাকিমের নির্দেশে গ্রেফতার করে জেলখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উক্ত কয়েদী তাকে জিজ্ঞাসা করলো- মুহাম্মদ গামারী -কে ইনি? উক্ত মুরীদ বললেন-ইনি আমার পীর। একথা শুনে কয়েদী ব্যক্তি বলে উঠ্‌লোঃ

يَاسَيِّدِىْ مُحَمَّدُ يَاغَمْرِىْ لَاحِظْنِىْ

অর্থাৎ হে সাইয়েদ মুহাম্মদ গামারী, আপনি আমার প্রতিও কৃপা দৃষ্টি করুন। একথা বলতে না বলতেই সাইয়েদ মুহাম্মদ গামারী (রহঃ) উক্ত কয়েদীর সামনে হাজির হলেন। বাদ্‌শাহ এবং তার পুলিশ বাহিনীর জীবনাশংকা দেখা দিল। তারা উক্ত কয়েদীকে উল্টা উপঢৌকন দিয়ে ছেড়ে দিলেন। (বাহ্‌জাতুল আস্‌রার)

৯নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

বিখ্যাত অলী হযরত মুসা ইবনে ইমরান (রহঃ) সম্পর্কে উক্ত বাহ্‌জাতুল আস্‌রার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছেঃ

"كَانَ اِذَا نَادَاهُ مُرِيْدُهُ اَجَابَهُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَنَةٍ وَاَكْثَرَ*

অর্থঃ "যখন তাঁর (মুসা) কোন মুরিদ তাঁকে সম্বোধন করে ডাক দিতেন, তখন তিনি এক বৎসরের দূরের রাস্তা অথবা তার চেয়েও বেশী দূরত্ব থেকে তাঁর মুরিদকে জওয়াব দিতেন।" (সুবহানাল্লাহ! এত দূরত্ব থেকেও আল্লাহর অলীগণ শুনেন ও জওয়াব দেন)

১০নং দলীলঃ

শাহ্‌ আবদুল আজিজ দেহ্‌লভী (রহঃ)এর বোস্তানুল মোহাদ্দেসীন গ্রন্থে আছেঃ

"হযরত আহমদ রাজুক্ব (রহঃ) বলেনঃ আমি আপন মুরিদগণের পেরেশানী দূর করি- যখন তারা যুগের চক্রান্তে পড়ে যায়। যদি তুমি বিপদে বা কঠিন অবস্থায় পতিত হও, তাহলে বলবেঃ

"نَادِبِهٖ يَارَزُّوْقُ آتِ بِسُرْعَتِهٖ *

অর্থঃ "হে রাজুক্ব -বলে তুমি আহবান করবে। আমি তৎক্ষনাৎ এসে হাজির হবো।"

১১নং দলীলঃ বর্ণনাঃ

আল্লামা শামী রদ্দুল মোহ্‌তার গ্রন্থে লিখেনঃ

"যার কোন জিনিস হারিয়ে যায়, সে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হযরত আহমদ ইবনে উল্‌ওয়ান (রহঃ) এর নামে ফাতেহা পাঠ করে তাঁকে উদ্দেশ্য করে এভাবে ডাক দিবেঃ

يَاسَيِّدِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُلْوَانَ *

ইয়া সাইয়েদী আহমদ ইবনে উলওয়ান।

১২নং দলীলঃ ঘটনাঃ

"হযরত সামসুদ্দিন মুহাম্মদ হান্‌ফী (রহঃ)-এর এক মুরিদকে এক চোর হত্যা করার ইচ্ছা করলো। মুরিদ তৎক্ষনাৎ 'ইয়া সাইয়েদী মুহাম্মদ ইয়া হান্‌ফী' বলে নিজ পীরকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলেন। হঠাৎ একটি কোদাল বা শাবল এসে উক্ত চোরের বুকে আঘাত করলো। চোর শাবলের আঘাতে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং উক্ত মুরিদ সহি সালামতে বাড়ী ফিরলেন।"

১৩নং দলীলঃ ঘটনাঃ

"উপরোক্ত অলী হযরত সামসুদ্দিন মুহাম্মদ হান্‌ফী (রহঃ)-এর স্ত্রী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হলেন। নেক বিবি এক বিখ্যাত অলী হযরত সাইয়েদ আহমদ বাদাভী (রহঃ)-এর নাম স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে এভাবে ডাক দিলেনঃ

يَاسَيِّدِىْ اَحْمَدُ بَدَوِىُّ خَاطِرُكَ مَعِىْ *

অর্থঃ "হে সাইয়েদ আহমদ বাদাভী! আপনার অন্তর (দৃষ্টি) আমার প্রতি হোক।"

একদিন উক্ত বিবি স্বপ্নে দেখেন- হযরত সাইয়েদ আহমদ বাদাভী (রহঃ) তাঁকে বলছেনঃ তুমি একজন উঁচু স্তরের অলী আল্লাহর আশ্রয়ে রয়েছো। বড় ধরনের অলীদের আশ্রয়ে যারা থাকেন, আমরা তাদের ডাকে সাড়া দেইনা। তুমি তোমার স্বামী হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ হান্‌ফীর নাম ধরে সাহায্য প্রার্থনা করো। তা হলে তোমার রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে। এস্বপ্ন দেখে বিবি 'ইয়া সাইয়েদী মুহাম্মদ ইয়া হান্‌ফী' বলে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলেন। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে দেখেন- তাঁর অসুখ ভাল হয়ে গেছে।"

১৪নং দলীলঃ ঘটনাঃ

"হযরত মাদ্‌ইয়ান ইবনে আহমদ (রহঃ)-এর জনৈক মুরিদের মেয়েকে এক বদ্‌মাইশ লোক জনমানবহীন জায়গায় ঘেরাও করলো। পিতার পীরের নাম মেয়েটির জানা ছিল। তাই সে এভাবে পীরকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলঃ

يَاشَيْخَ اَبِىْ لَاحِظْنِىْ

অর্থঃ "হে আমার পিতার পীর! আপনি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন"। একথা বলতেই একটি অদৃশ্য শাবল এসে ঐ বদ লোকটির বুকে লাগলো। এতে ঐ মেয়েটির ইজ্জত রক্ষা হলো"। (বাহ্‌জাতুল আস্‌রার)।

মোট কথাঃ আউলিয়ায়ে কোরামকে উদ্দেশ্য করে সাহায্যার্থে ডাকা প্রতি যুগেই প্রচলিত ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। খোদার নবীর অভিশপ্ত ওহাবী সম্প্রদায় শত ইচ্ছা করলেও তা রোধ করতে পারবেনা। -তারা একাজকে হারাম বলুক আর কুফর ও

শিরকই বলুক না কেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসুল মকবুল (দঃ)-এর উম্মতের যদি এই শান ও মর্য্যাদা হয়, তাহলে নবী করিম (দঃ)-এর শান ও মান কত উচ্চ হবে- তা কল্পনাতীত ব্যাপার। অলী আল্লাহগণকে উদ্দেশ্য করে ডাক দেয়া যদি যায়েজ হয়, তাহলে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে হুজুরকে সম্বোধন করার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। বরং নবী করিম (দঃ) স্বয়ং তাঁকে সম্বোধন করার শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। যথা ঃ

১৫নং দলীলঃ হাদীসঃ

ইমাম তিরমিজি, নাসায়ী, ইব্‌নে মাজা, হাকিম প্রমুখাত প্রথম সারির মোহাদ্দেসীন কেরাম হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক অন্ধ সাহাবীকে তিনি নামাজের পর নিম্নোক্ত দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

"اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ * يَامُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِىْ * اَللّٰهُمَّ تَشَفَّعْهُ فِىَّ"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর তোমার প্রিয় নবীর উছিলা ধরে তোমার দিকে মুখ করছি-যিনি রহমতের নবী।। হে মুহাম্মদ রাসুল (দঃ)! আমি আপনাকে মাধ্যম করে আমার প্রতিপালকের দিকে মুখ ফিরাচ্ছি- আমার এই হাজত পূর্ণ হওয়ার জন্য। হে আল্লাহ! আমার ক্ষেত্রে তোমার প্রিয় হাবীবের সুপারিশ কবুল করো।"

(উক্ত হাদীসে রাসুল করিম (দঃ) কে সম্বোধন করার উল্লেখ আছে। হুজুর (দঃ) এর ইনতিকালের পরেও সাহাবাগণ তা আমল করতেন এবং অদ্যাবধি তা চালু আছে।)

১৬নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

তিবরানী শরীফে হুজুর (দঃ)-এর ইনতিকালের পর উপরোক্ত দোয়া পাঠের প্রমাণঃ

অনুবাদঃ "হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) জনৈক অভাবী লোক তার খেদমতে আসা যাওয়া করতো। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর দিকে মনোযোগ দিতেন না এবং তাঁর অভাবও পূরণ করতেন না। ঐ ব্যক্তি অন্য এক সাহাবী হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রাঃ)-এর নিকট এ ব্যাপারটি জানালেন। হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রাঃ) ঐ লোকটিকে ১৫ নম্বরে বর্ণিত দোয়াটি মসজিদে গিয়ে দু'রাক্‌আত নফল নামাজ আদায়ান্তে পাঠ করতে বললেন। তিনি তাই করলেন এবং রাসুল করিম (দঃ) কে সম্বোধন করে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজ অভাবের কথা পেশ করলেন। এরপর দরবারে খেলাফতে হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন।

দারোয়ান এসে তাঁকে হাত ধরে সম্মানের সাথে হযরত ওসমান (রাঃ)এর দরবারে নিয়ে গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এবার তাঁকে সসম্মানে নিজ পার্শ্বে বসালেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন এবং ঘটনা শুনলেন। ঘটনা শুনে তৎক্ষনাৎ তাঁর অভাব পূরণ করে দিলেন। তিনি এও বললেন, এতদিন পর তুমি আমাকে অভাবের কথা জানালে। যখনই কোন প্রয়োজন হয়- তৎক্ষনাৎ এসে আমাকে জানাইও।" সুব্‌হানাল্লাহ! হুজুর (দঃ)-এর ইনতিকালের পরেও তাঁকে উদ্দেশ্য করে সাহায্য চাইলে এভাবেই গায়েবী মদদ হয়ে থাকে।

১৭নং দলীলঃ রেওয়াত ও ঘটনাঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর "আদব" গ্রন্থে এবং ইমাম ইব্‌নুস সুন্নী তাঁর গ্রন্থ "আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাতি" -তে নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেনঃ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর পা অবশ (প্যারালইসিস) হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে কেউ বললেনঃ আপনার অতি প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ করুন। ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করিম (দঃ)কে স্মরণ করলেন এবং يَامُحَمَّدَاهُ -ইয়া মুহাম্মাদাহ বলে হুজুর (দঃ)কে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলেন। সাথে সাথে তাঁর অবশ পা সুস্থ হয়ে গেল।"

১৮নং দলীলঃ দ্বিতীয় ঘটনাঃ

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নবভী (রহঃ) "কিতাবুল আজকার" নামক গ্রন্থে অনুরূপ আর একটি ঘটনা লিখেছেনঃ "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তিনি يَامُحَمَّدَاهُ ইয়া মুহাম্মাদাহ বলে হুজুর (দঃ) কে উদ্দেশ্য করে ডাক দেন। সাথে সাথে তাঁর রোগ ভাল হয়ে যায়।"

১৯নং দলীলঃ

মদিনাবাসীগণ প্রাচীনকাল থেকেই يَامُحَمَّدَاهُ শ্লোগান দেয়ার প্রথা চালু করেছেন। প্রমাণস্বরূপ আল্লামা ইবনে কাসিরের (৭৭৪ হিঃ) বিখ্যাত গ্রন্থ "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" ৬ষ্ঠ খন্ড ৩২৩ পৃষ্ঠায় ইয়ামামার যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ "ত্রিশ হাজার সাহাবী নিয়ে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ১১ হিজরীতে খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নির্দেশে ইসলাম ত্যাগী নবুয়্যতের ভন্ড দাবীদার মুরতাদ মোসায়লামা কাজজাব-এর বিরুদ্ধে জোহাদের সময় সমস্বরে يَامُحَمَّدَاهُ বলে না'রা দিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসিরের এবারত নিম্নরূপঃ

فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَنَا ابْنُ الْوَلِيْدِ الْعَوْدُ اَنَا ابْنُ زَيْدٍ وَّعَامِرٍ ثُمَّ نَادٰى بِشِعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَامُحَمَّدَاهُ " (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ج ٦ صفه ٣٢٣)

অর্থঃ "হযরত খালেদ (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেনঃ আমি ওয়ালিদের পুত্র খালেদ! আমি যায়েদ ও আমেরের বংশধর। একথা বলেই তিনি মুসলমানদের প্রতীক চিহ্ন দ্বারা শ্লোগান তোলেন। ঐ যামানায় (১১ হিজরী) মুসলমানদের বিশেষ ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন ছিল يَا مُحَمَّدَاهْ বলে না'রা লাগানো।" – (আল্লামা ইবনে কাসিরের– বেদায়া ও নেহায়া ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৩)।

ইবনে কাসিরের এই বর্ণনাটি বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ওহাবী সম্প্রদায়ের দাঁতভাঙ্গা জবাব। তারা বলেঃ নারায়ে রিসালাত-ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা শিরক ও হারাম। অথচ আল্লামা ইবনে কাসির প্রমাণ করলেন- ১১ হিজরীতে সাহাবায়ে কেরামের যুগেই উক্ত শ্লোগান মুসলমানদের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সাহাবাগণের আমলকে হারাম বা না যায়েজ বলা গোমরাহী ও কুফরীর শামিল। বিশেষ করে ত্রিশ হাজার সাহাবীর সম্মিলিত আমলকে এন্‌কার করা জঘন্য অপরাধ হিসাবে গণ্য– (অনুবাদক)। না'রায়ে রিসালাত পন্থী মুসলমানগণ এই দলীলটি খুব মনোযোগ দিয়ে শিখে নেবেন। ইয়া মুহাম্মাদাহ, ইয়া রাসুলাল্লাহ একই অর্থবহ।

২০নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

আল্লামা খাফাজী (রহঃ)-এর "নাসিমুর রিয়াজ" গ্রন্থে আছেঃ

هٰذَا مِمَّا تَعَاهَدَهُ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ

অর্থঃ "ইয়া মুহাম্মাদাহ! ইয়া রাসুলাল্লাহ- বলে নবী করিম (দঃ) কে ডাকা মদিনাবাসীগণের অভ্যাস ও প্রতীক চিহ্ন হিসাবে গণ্য হতো।"

সার কথাঃ

নবী করিম (দঃ)-এর হাদীসের দ্বারা তাঁকে 'ইয়া মুহাম্মদ (দঃ) বলে সম্বোধন করা, তাঁর ইনতিকালের পর হযরত ওসমান এবনে হানিফ (রাঃ) কর্তৃক অন্য একজনকে উক্ত দোয়া আমল করানো, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক 'ইয়া মুহাম্মদাহ' বলে সাহায্য প্রার্থনা করা, ত্রিশ হাজার সাহাবী নিয়ে হযরত খালেদ বিদেশের মাটি থেকে 'ইয়া মুহাম্মাদাহ বলে সাহায্য চাওয়া, অন্যান্য বর্ণনা মোতাবেক অলীগণকে দূর থেকে আহবান করা -ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার ভাবে ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া আলী, ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী বলা যায়েজ ও উত্তম বলে প্রমাণিত হওয়ার পরও ওহাবী সম্প্রদায় কিভাবে এটাকে শিরক ও কুফর বলছে? যেমন বেহেস্তী জেওর। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে "আসসালামু আলাইকা আইউহান্ নাবীউ" বলে সম্বোধন করা বৈধ হল কিভাবে? বেহেস্তী জেওরের প্রণেতাকে এর জবাব দিতে হবে।

২১নং দলীলঃ

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন হাসান সাঞ্জারী (রহঃ) বলেনঃ

" كعبهٔ دل قبلهٔ جان يارسول الله توئى – سجدهٔ مسكين حسن هر لحظه باداسوے تو" (البصائر للعلام حمد الله الداجوى)

অর্থঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আমার অন্তরের কা'বা এবং প্রাণের ক্বেব্‌লা। মিস্‌কিন হাসান সর্বদা আপনার দিকেই মনকে সেজদানত রাখে।" – (আল-বাসায়ের)। পৃষ্ঠা-৭৭

২২নং দলীলঃ

আশ্‌রাফ আলী থানবী সাহেবের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজির মককী বলেনঃ

"خيال ما سوادل سے مٹادو يارسول الله– حجاب ظلمت بشرى اٹھا دو يارسول الله"

অর্থঃ "হে আল্লাহর রাসুল! আমার অন্তরের মধ্য হতে অন্যের খেয়াল দূর করে দিন! ইয়া রাসুলাল্লাহ! মানবীয় অন্ধকারের পর্দাটি আপনি অপসারণ করে দিন।" (ইমদাদুল মোস্তাক)।

সুবহানাল্লাহ্! খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) আজমীর শরীফ থেকে নবীজীকে সম্বোধন করে নিবেদন করছেন। আর থানবী সাহেবের পীর কেবলা হিন্দুস্তান থেকে নবীজীকে শুধু ডাকই দেননি; বরং এমন জিনিসের প্রার্থনা করছেন যা খোদার ক্ষমতার এখ্‌তিয়ারভুক্ত। থানবী সাহেব নিজ পীর সম্বন্ধে কি বলবেন?

২৩নং দলীলঃ

৬১ হিজরী সনে দামেস্কে এজিদের বন্দীশালায় আবদ্ধ ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) কর্তৃক ইয়া রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন - বলে নবীজীর কাছে সাহায্য প্রার্থনাঃ

"يَارَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ اَدْرِكْ لِزَيْنِ الْعَابِدِيْنَ + مَحْبُوْسٌ اَيْدِى الظَّالِمِيْنَ فِىْ مَوْكَبٍ وَمُزْدَحَمٍ*

অর্থঃ "হে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (দঃ)! আপনি অধম জয়নুল আবেদীনকে সাহায্য করে উদ্ধার করুন। কেননা আমি জালেমদের হাতে বন্দী রয়েছি এবং অতি দুঃখ-কষ্ট আর সংকীর্ণতার মধ্যে বসবাস করছি।" (আল-বাসায়ের পৃষ্ঠা ৩৭)।

মন্তব্য ঃ কোথায় মদিনা মোনাওয়ারা আর কোথায় দামেস্কে এজিদের বন্দীশালা! হুজুরের ইনতিকালের ৫০ বৎসর পর দামেস্ক হতে হুজুর (দঃ)-এরই বংশধর ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রাঃ) উক্ত ফরিয়াদ। থানবী সাহেবের ফতোয়া মতে ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) কি হয়ে যাচ্ছেন? (নাউজুবিল্লাহ!) নবীবংশের ইমামগণের কথা ও কাজ হচ্ছে ইসলামের দলীল। এর বিরুদ্ধাচারণ হচ্ছে ইয়াজিদী কাজ! আল্লাহ আমাদেরকে নবী বংশের শত্রু থেকে পানাহ্ দিন এবং তাদের প্রতারণামূলক ধোকাবাজি থেকে সতর্ক রাখুন! আমীন।

(বিঃ দ্রঃ পাঠকের সহজে হৃদয়গ্রাহী হওয়ার উদ্দেশ্যে ২০,২১,২২ ও ২৩ নং দলীল চারখানা অনুবাদকের নিজস্ব সংগ্রহ)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অলী-আল্লাহ্‌গণের নিকট কিছু চাওয়া প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওর ঃ

کسی کو نفع نقصان کامختار سمجھنا -کسی سے

مرادیں مانگنا روزی اولاد مانگنا (شرک وکفر ہے *

অর্থঃ "কাউকে কল্যাণ-অকল্যানের ক্ষমতাবান মনে করা, কারও কাছে মনোবাসনা পূরণের প্রার্থনা করা, রোজী-রোজগারও সন্তান প্রার্থনা করা -শিরক ও কুফর।" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ভূমিকাঃ

ইসলামী আকিদা মতে কল্যাণ-অল্যাণ, রোজী-রোজগার ও সন্তানাদির স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন প্রকৃত পক্ষে একমাত্র আল্লাহ! কিন্তু তিনি এগুলো বাস্তবায়ন করেন ফেরেস্তা, নবী-রাসুল, অলী-গাউসগণের মাধ্যমে। যেমন ফেরেস্তা এসে মায়ের পেটে সন্তানের দেহ তৈরী করেন, রূহ প্রদান করেন, ভাগ্য লিখে দিয়ে যান- ইত্যাদি। মিকাইল (আঃ) রিজিক বন্টন করেন, বৃষ্টিপাত প্রয়োজনমত বর্ষণ করেন। রাআদ ফেরেস্তা মেঘমালা পরিচালনা করেন- ইত্যাদি। এরা বিশ্বজগত পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। আরবীতে বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেস্তগণকে "মুদাব্বিরুল উমুর" বলা হয়। তদ্রূপ মানব জাতির মধ্যেও নবী রাসুল, গাউস কুতুবগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কোন কোন কাজ সম্পাদন করেন। যেমনঃ নবী করিম (দঃ) দীর্ঘ এক হাদীসে ৩৫৬ জন শীর্ষস্থানীয় অলি-আল্লাহ্‌র গুণাবলী বর্ণনা করে বলেছেন-তাঁদের উছিলায় ও তাঁদের মাধ্যমে আমার উম্মতের রিজিক বৃদ্ধি হয়, রহমতের বৃষ্টি নাজিল হয় ও বালা মুসিবত দূর হয়। (ইবনে আসাকির-ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস)। অনুরূপভাবে ডাক্তার, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে রোগ ভাল করেন। শহর, বন্দর আলোকিত করেন। স্থল-পথ, নৌ-পথ ও আকাশ পথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞানীদের নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব জাতির অফুরন্ত কল্যাণ সাধন করেন। আবার তাদের আবিকৃত মারনাস্ত্রের মাধ্যমেই মানব জাতির প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সুযোগ করে দেন। এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি কৌশল। অথচ সবাই বলে-ডাক্তার রোগ ভাল করেন, মা সন্তানকে দুধ দেন, মুরগী ডিম দেয়, পিতা সন্তান জন্ম দেন -- ইত্যাদি। মানুষ ডাক্তারের কাছে ঔষধ চায়, ধনীর কাছে সাহায্য চায়, মায়ের কাছে ভাত চায়। তাই বলে কি তাদেরকে মালিক মনে করে? তদ্রূপঃ নবী-রাসুল, অলী-গাউসদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জাগতিক ও পারলৌকিক অনেক

কল্যাণ সাধন করেন। তাঁদের দরবারে গেলে রিজিক, সন্তান ইত্যাদি মনোবাসনা পূরণ হয়। এগুলো আল্লাহরই ব্যবস্থাপনা। সরাসরি কোন কাজ আল্লাহ নিজে সম্পাদন করলে তাকে বলা হয় কুদরত। আর নবীগণের মাধ্যমে সম্পাদন করলে তাকে বলা হয় মোজেজা। অলীগণের মাধ্যমে সম্পাদন করলে তাকে বলা হয় কারামত। এটাই সঠিক ইসলামী আকিদা। যারা শুধু আল্লাহর কুদরত স্বীকার করে, তারা ভ্রান্ত। আর যারা কুদরত, মোজেজা ও কারামত-তিনটিকেই স্বীকার করেন- তাঁরাই হচ্ছেন খাঁটী ঈমানদার। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই নবী রাসুল ও অলি-আল্লাহগণকে এই অলৌকিক শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ হচ্ছেন মৌলিক শক্তির অধিকারী। আর নবী-অলীগণ হচ্ছেন প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। কোরআন, হাদীস, ইজ্‌মা, কিয়াস- এই চার দলীলের দ্বারাই এসব প্রমাণিত। তাই হুট্ করে কোন মুসলমানকে একারণে কাফের ও মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা শয়তানী ও হঠকারিতারই পরিচায়ক। ওহাবী সম্প্রদায় নবী-রাসুল ও অলী গাউসগণের নবুয়তী ও বেলায়তী শক্তির ঘোর বিরোধী। এরই ফলশ্রুতিতে এসব বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস। আল্লাহর নেয়ামত ও রহমতের দরজা হলেন–নবী ও অলীগণ। এর হাজার হাজার প্রমাণ কোরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান রয়েছে। এবার আমরা আল্লামা হাশমত আলী (রহঃ)-এর গ্রন্থের অনুবাদ পেশ করছি– অনুবাদক।

ইসলাহ্ বা ভুল সংশোধনঃ

কল্যাণ-অকল্যাণ সংঘটনকারী, মনোবাসনা পূরণকারী, প্রার্থিত বস্তু দানকারী, রিজিক ও সন্তান দানকারী মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা। সমস্ত মুসলমানের ইহাই বিশ্বাস। চাই সে যতবড় জাহেলই হোক্‌না কেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় বান্দা, আউলিয়ায়ে কেরাম, আম্বিয়ায়ে ইজাম, বিশেষ করে মানবকুলের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে মানুষের উপকার-অপকার সাধনের ক্ষমতা দান করেছেন। কারও মনোবাসনা পূরণ করা, মুশকিল আসান করা, বিপদে মানুষকে সাহায্য করা- ইত্যাদি ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে দিয়েছেন। তাঁদেরকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মোখ্‌তার (আধ্যাত্মিক শক্তিমান) বানিয়েছেন। একারণেই মানুষ তাঁদের নিকট থেকে তাঁদের জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পরও উপকার লাভ করে থাকে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজে তাঁদের নিকট থেকে অজস্র তাসাররুফ (আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ) প্রকাশ পায়। একারণেই মানুষ তাঁদের নিকট যান, তাঁদের কাছে মনের বাসনা পূরণের প্রার্থনা করেন, বাসনা করেন, বিপদে আপদে তাদেরকে স্মরণ করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। আপন আপন ফরিয়াদ তাঁদের খেদমতে পেশ করে মানুষ তাঁদেরকে খোদার দরবারে উছিলা বানিয়ে দোয়া করেন এবং মনোবাসনা পূরণের জন্য তাঁদেরকে মাধ্যম মনে করেন। এ মর্মেই আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে দুটি আয়াতে মাধ্যম অনুসন্ধানের নির্দেশ করেছেন। নবী করিম (দঃ) কে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

১নং দলীলঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوااللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا *

অর্থঃ "হে প্রিয় রাসুল! আপন আত্মার উপর জুলুমকারী লোকেরা যদি আপনার দরবারে হাজির হয়, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর রাসুল তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসাবে পাবে।" –সুরা নিসা ৬৪ আয়াত ৫ম পারা।

উক্ত আয়াতে দুটি মসআলা প্রমাণিত হয়েছে। যথা ঃ

১) আল্লাহর দরবারে কোন বিষয়ে আরজ করার সময়ে তাঁর প্রিয় রাসুল ও প্রিয় বান্দাগণকে উসিলা বানানো জায়েজ ও উত্তম এবং কৃতকার্যতার জন্য খুবই উপকারী।

২) মনোবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে রওজাপাকে বা মাজার শরীফে গমন করা নবী যুগের এবং সাহাবা যুগের স্বীকৃত সর্বোৎকৃষ্ট আমল। উক্ত আয়াত "জা-উকা" 'আপনার দরবারে আসে' সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। ইন্তিকালের পরেও মদিনা যাওয়ার অনুমোদন এতে রয়েছে। 'জাউকা' শব্দটি মদিনার জন্য নির্দিষ্ট নয়- বরং নবীজীর দরবার ও সর্বত্র উপস্থিতির-তথা হাজির ও নাজির ইঙ্গিত বহ। নবী করিম (দঃ) মোমেনদের প্রাণের চেয়েও নিকটে (কোরআন)

২নং দলীলঃ

দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য অলী-আল্লাহগণের উসিলা ধরা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُو اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ *

অর্থঃ "হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আল্লাহকে পাওয়ার জন্য উছিলা তালাশ করো।" সুরা মায়েদা আয়াত-৩৫।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর "কাউলুল জামিল"–এ বলেনঃ 'আমানু' শব্দ দ্বারা ঈমান, 'ইত্তাকু' শব্দ দ্বারা আমল এবং 'ওয়াসিলা' শব্দ দ্বারা পীর-মাশায়েখের উছিলা বা তাঁদের মাধ্যমে জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অনুসন্ধান করা বুঝানো হয়েছে।

মোদ্দা কথা–মুসলমানগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের দরবারে আল্লাহর নির্দেশেই যাতায়াত করে থাকেন এবং তাঁদেরকে কল্যাণ ও আল্লাহর রহমতের উসিলা বা মাধ্যম মনে করেন। তাঁদেরকে মৌলিক কর্ম সম্পাদনকারী বা সয়ম্ভু কখনো মনে করেন না।

মুসলমানদের এই আকিদা-বিশ্বাস শিরক তো দূরের কথা, হারামও নয়। নিঃসন্দেহে ইহা জায়েজ ও বৈধ। উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত নিজ নিজ গ্রন্থে কোরআন-সুন্নাহ ও ইমামগণের মতামত উল্লেখ করে এধরনের সাহায্য প্রার্থনা করার বৈধতা প্রমান করে গেছেন। ঐগুলি থেকে নির্বাচন করে আরও কতিপয় দলীল নিম্নে পেশ করা হলো। বিস্তারিত জান্‌তে হলে ঐসব কিতাব অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

৩নং দলীলঃ

নবী করিম (দঃ)-এর খাদেমগণের মধ্যে হযরত রবিয়া ইবনে কা'ব আসলামী (রাঃ) রাত্রে জাগরণ করে হুজুর (দঃ)-এর খেদমত করতেন। তাহাজ্জুদের সময় ঢিলা কুলুক ও অজুর পানি সরবরাহ করতেন। একরাত্রে হযরত রবিয়া (রাঃ)কে একাকী পেয়ে নবী করিম (দঃ)এর রহমতের দরিয়ায় জোশ্ এসে গেলো। হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেনঃ

سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ (مِشْكٰوةٌ بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِهٖ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ اَسْلَمِيّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ "হে রবিয়া! তোমার যা ইচ্ছা হয়-চেয়ে নাও। রাবিয়া (রাঃ) বল্লেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি বেহেস্তের মধ্যে আপনার সাথে থাকার জন্য আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি। নবী করিম (দঃ) বললেনঃ এটা মঞ্জুর হলো। এছাড়া আরও কিছু চাও কিনা? আমি আরজ করলামঃ শুধু ইহাই চাই। নবী করিম (দঃ) বললেনঃ তাহলে তুমি এ ব্যাপারে বেশী বেশী নফল নামাজ পড়ে আমাকে সাহায্য করো।" (মুসলিম শরীফে রবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খানা মিশকাত শরীফ বাবুস সুজুদ ওয়া ফাদ্‌লিহি অধ্যায়ে সংকলিত)।

পর্যালোচনাঃ

উক্ত হাদীসে নিম্নের কয়েকটি মস্‌আলা প্রমাণিত হলো। যথাঃ

১) নবী করিম (দঃ)-এর বিশিষ্ট খাদেম রবিয়া (রাঃ) কর্তৃক নিজের ঘটনা বর্ণনা।

২) নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তাঁকে যে কোন জিনিসের প্রার্থনা করার অনুমতি দান। তাও আবার তাঁর কাছেই। সরাসরি আল্লাহর কাছে নয়।

৩) রবিয়া (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর কাছে বেহেস্ত প্রার্থনা করলেন। সাধারণ বেহেস্ত নয়। স্বয়ং নবী করিম (দঃ)-এর বেহেস্ত। উদ্দেশ্য ছিল খেদমত করা ও সান্নিধ্য লাভ করা।

৪) এছাড়াও অন্য কিছু প্রার্থনা করার জন্য নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তাঁকে উৎসাহিত করা। আল্লাহর দীদার ও সান্নিধ্য লাভ এই সুযোগদানের অন্তর্ভুক্ত।

৫) কিন্তু হযরত রবিয়া (রাঃ) অন্য কিছু না চেয়ে শুধু দীদারে মোস্তফা ও খেদমতে মোস্তফা (দঃ) প্রার্থনা করলেন- নবীজীরই কাছে। এটাই এশকের পরীক্ষা।

৬) নবী করিম (দঃ) এ ব্যাপারে রবিয়া (রাঃ)-এর কাছে সাহায্য চাইলেন বেশী বেশী নফল নামাজ পড়ার। এ যেন রোগীর কাছে ডাক্তারের সাহায্য চাওয়া–পথ্য ঠিকমত খাওয়ার ও নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য।

৭) দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য খোদা ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েজ ও বৈধ। অত্র হাদীস তার প্রমাণ।

৮) নবী করিম (দঃ) যাকে ইচ্ছা, বেহেস্ত দান করতে পারেন- আল্লাহর অনুমোদনক্রমে।

সুতরাং অন্যের কাছে কিছু প্রার্থনা করা শিরিক নয়- যেমন দাবী করেছেন থানবী সাহেব (অনুবাদক কর্তৃক অতিরিক্ত দলীল হিসাবে পেশ করা হলো)।

৪নং দলীল ঃ (অনুবাদক কর্তৃক)

উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) আশিয়াতুল লোম্‌আত শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেনঃ

"واز اطلاق سوال کہ فرمود سل وتخصیص نہ کرد بمطلوبے خاص معلوم می شود کہ کار ہمہ بدست ہمت وکرامت اوست ہرچہ خواہد ہرکراخواہد باذن پروردگار خود بدہد"

অর্থ ঃ নবী করিম (দঃ) "ছাল" অর্থাৎ "যা মনে চায় প্রার্থনা করো" বলে নির্দ্দিষ্ট কোন জিনিস সীমাবদ্ধ না করে বরং ব্যাপকভাবে চাওয়ার অনুমতি দেয়ার মধ্যেই প্রমাণিত হলো যে, নবী করিম (দঃ)-এর ইচ্ছা ও কারামতের ক্ষমতায় যাবতীয় সমাধান নিহিত। তিনি যা চান, যাকে চান- আপন রবের অনুমোদনক্রমে নিজেই দিতে পারেন।" (আশিয়াতুল লোম্‌আত)। (কোথায় আশ্রাফ আলী থানবী, আর কোথায় শেখ দেহ্‌লভী (রহঃ)। কার কথা দলীল হিসাবে গণ্য হবে?

৫নং দলীলঃ হাদীস শরীফঃ (অনুবাদক)

দারমী শরীফে উল্লেখিত একখানা হাদীসে দেখা যায়, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করার মানসে বৃষ্টি লাভের আশায় একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওজা মোবারকের ছাদ খানিক উন্মুক্ত করে দিলে সাথে সাথে বৃষ্টি নাজিল হয় এবং ফলে ফসলে, তরুলতায় মদিনার জমীন শস্যময় হয়ে উঠে এবং লোকের দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়। হাদীসখানা নিম্নরূপঃ লোকেরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করে বৃষ্টির জন্য দোয়া চাইলে তিনি বল্লেনঃ

اُنْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كُوًى اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَايَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوْا فَمُطِرُوْا وَاُمْطِرُوْا حَتّٰى نَبَتَتِ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْاِبِلُ حَتّٰى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامُ الْفَتْقِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

অর্থঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর রওজা মোবারকের উপর থেকে ছাদ ছিদ্র করে দাও, যাতে নূরানী কবর ও আসমানের মধ্যখানে ছাদ বাধা সৃষ্টি না করে। লোকেরা তাই করলেন। সাথে সাথে প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো। এর ফলে উদ্ভিদ জন্মালো, উট হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে চর্বিতে ভরে উঠলো। ঐ বছরকে আ-মুল ফিতাক বা চর্বি ও হৃষ্ট-পুষ্টের বছর নাম রাখা হলো।"

উক্ত ঘটনায় নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকের উছিলায় লোকদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হলো। অথচ থানবী সাহেব বলছেন-কাউকে কল্যাণের মালিক মনে করা শিরক। তিনি মালিক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে খুবই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে-মালিকানা দুই প্রকার। মৌলিক মালিকানা আল্লাহর আর দানসূত্রে মালিকানা হচ্ছে নবী ও অলীগণের। যেহেতু তাঁদের মাধ্যমেই কার্য্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন, হযরত ইছা (আঃ) বলেছেন ঃ আমি মাটি দিয়ে পাখীর সুরত বানিয়ে তাতে ফুঁক দিলে আসল পাখী হয়ে উড়ে যায়। আমি খোদার নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আমি ভাল করি। ইছা (আঃ) এর 'আমি করি'- বলার ব্যাপারে থানবী সাহেব কি বলবেন?

৬নং দলীল ঃ হাদীস শরীফ (অনুবাদক)

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে একবার দেশে খরা দেখা দিলে হযরত বিলাল ইবনে হারিস (রাঃ) নামের একজন সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর রওজা পাকে হাজির হয়ে প্রথমে জিয়ারত করলেন এবং জেয়ারত শেষে হুজুর (দঃ)-এর খেদমতে এই

আরজ করলেনঃ

"فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا- فَاَتَاهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ وَاَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ فَكَانَ كَذَالِكَ وَفِيْهِ اِئْتِ عُمَرَ فَاَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ - وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْكَيْسُ اَلْكَيْسُ اَىْ اَلرِّفْقُ لِاَنَّهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ شَدِيْدًا فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ فَاَخْبَرَهُ فَبَكٰى ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ مَا اٰلُوْ اِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ" *

অর্থ ঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আপনার উম্মত অনাবৃষ্টিতে ধ্বংস হওয়ার পথে। নবী করিম (দঃ) স্বপ্নে ঐ সাহাবীর সাথে দেখা দেন এবং বলেনঃ তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হবে। ঠিক তাই হলো। অন্য বর্ণনা মতে নবী করিম (দঃ) তাঁকে স্বপ্নে বললেনঃ ওমরকে গিয়ে আমার সালাম জানিয়ে বলো যে, তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হবে। ওমরকে শাসন কার্য্যে নরম হতে বলো। কেননা, সে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে খুবই কঠোর। আদেশ অনুযায়ী হযরত বেলাল ইবনে হারিস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে সংবাদ জানালেন। হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে ক্রন্দন শুরু করলেন এবং সগোক্তি করে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি একান্ত বাধ্য না হলে যে নরম হতে পারিনা।" – (জওহারুল মুনাজ্জম–ইবনে হাজর মক্কী)

এতে প্রমানিত হলো-ইনতিকালের পর কাউকে সম্বোধন করে কিছু দোয়া চাওয়া ও আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা জায়েজ। এসব ঘটনাকে কটাক্ষ করেই থানবী সাহেব বলেছেন-"কারও কাছে কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা বা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মোখতার মনে করা শিরক ও কুফর"। আল্লাহ আমাদেরকে বাতিল সম্প্রদায় থেকে সতর্ক রাখুন।

৭নং দলীলঃ (অনুবাদক)

হযরত ওমর (রাঃ) -এর খেলাফত কালের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। মিশর জয় করার পর হযরত ওমর (রাঃ) আমর ইবনে আ'স নামক সাহাবীকে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। মিশরীয় লোকদের মধ্যে একটি কুপ্রথা চালু ছিল। নীল নদে পানি কমে গেলে নির্ধারিত সময়ে একজন সুন্দরী মহিলাকে গহনাপত্র পরিধান করিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নীল নদে নিক্ষেপ করা হতো। তাতে নদীতে জোয়ার আস্‌তো। গভর্ণর আমর ইবনে আস (রাঃ) এ ঘটনা লিখে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশ প্রার্থনা করেন। হযরত

ওমর (রাঃ) নীল নদের নামে একখানা চিঠি লিখলেন। এই চিঠিখানা নীল নদে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ

يَا اَيَّتُهَا النِّيْلُ اِنْ كُنْتَ تَجْرِىْ بِاَمْرِ اللّٰهِ فَاجْرِىْ وَاِنْ كُنْتَ تَجْرِىْ بِاَمْرِكَ فَاَمَرَكَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ تَجْرِىَ بِاَمْرِىْ (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ لِاِبْنِ كَثِيْرٍ)

অর্থঃ "হে নীলনদ ! যদি তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে নিয়মমত প্রবাহিত হতে থাকো। আর যদি তোমার ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাকো,তা হলে আমিরুল মোমেনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে-এখনই পূর্ণভাবে প্রবাহিত হও।" (বেদায়া-নেহায়া-কারামতে ওমর)।

গভর্ণর আমর ইবনুল আস (রাঃ) নির্দেশ মোতাবেক উক্ত পত্রখানা নীল নদে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে ১৬ হাত উঁচু হয়ে পানি প্রবাহিত হলো। তখন থেকে মিশরীয়দের উক্ত কুপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়। এখানে আল্লাহর অধীন নীল নদ হযরত ওমরের নির্দেশে প্রবাহিত হলো। ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে তিনি মিশরবাসীদের অজস্র কল্যাণ সাধন করলেন। অথচ থানবী সাহেব বল্‌ছেন-কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মোখতার মনে করা শিরক ও কুফর। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী পরিচালনা করেন ফেরেস্তাদের মাধ্যমে। রিজিক ও বৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন হযরত মিকাইল (আঃ)কে। খোদা তায়ালার এই নিয়মকে অস্বীকার করাই বরং কুফরী।

৮নং দলীলঃ (আল্লামা হাশমত আলী)

শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) আশিয়াতুল লোমআত শরহে মেশকাতে বলেনঃ

"لیت شعری چه میخواہند ایشاں باستمداد وامداد که ایں فرقه منکر اند آنرا - انچه مامی فهمیم ازاں اینست که داعی دعاکند خدا وتوسل کند بروحانیت ایں بندهٔ مقرب یاندا کند ایں بنده مقرب راکه بنده خدا و ولی وئے شفاعت کن مرا وبخواه از خدا که بدہد مطلوب ومسئول مرا - اگر

ایں معنی شرك باشد چنانکه منکریں زعم می کنند بایدکه منع کرده شود توسل وطلب دعا از دو ستان خدا در حالت حیات نیز - وایں ممنوع نیست بلکه مستحب ومستحسن ست باتفاق وشائع ست در دیں"*

অর্থঃ "আমার বুঝে আসেনা-এরা কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও সাহায্য করা সম্পর্কে কি ধারনা পোষণ করে? এই ফের্কার লোকেরা সাহায্য প্রার্থনা করা ও সাহায্য করার গোটা বিষয়টিই অস্বীকার করে থাকে। সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই- দোয়াকারী দোয়া করেন খোদার কাছে এবং উসিলা ধরেন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার রূহে পাককে, অথবা এই নৈকট্যলাভকারী বান্দাকে ডাক দেন এই বলে-হে আল্লাহর বান্দা! হে আল্লাহর অলী! আপনি আমার ব্যাপারে সুপারিশ করুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন- যেন তিনি আমার প্রার্থিত মনোবাসনা পূরণ করে দেন। যদি এ কথাকে শিরক বলা হয়, যেমন বিরূদ্ধবাদীরা মনে করে থাকে। এমনকি জীবিত অলীগণের নিকটও অনুরূপ প্রার্থনা করাকে এরা অস্বীকার করে। তাহলে জেনে রাখো-একাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়; বরং ওলামাগণের ঐক্যমতে ইহা মোস্তাহাব ও উত্তম কাজ। ইসলাম ধর্মে ইহা বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।" (আশিয়াতুল লোমআত)।

৯নং দলীলঃ

ইমাম ইবনুল হাজ্ব মাদ্‌খাল গ্রন্থে লিখেনঃ

اِنْ كَانَ مَيِّتُ الْمَزَارِ مِمَّنْ تُرْجٰى بَرْكَتُهٗ فَيَتَوَسَّلُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِهٖ وَيَبْدَأُ بِالتَّوَسُّلِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ هُوَ الْعُمْدَةُ وَالْاَصْلُ فِىْ هٰذَا كُلِّهٖ وَالْمُشَرِّعُ لَهٗ ثُمَّ يَتَوَسَّلُ بِاَهْلِ تِلْكَ الْمَقَابِرِ اَعْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ مِنْهُمْ فِىْ قَضَاءِ حَوَائِجِهٖ وَمَغْفِرَةِ ذُنُوْبِهٖ وَيُكْثِرُ التَّوَسُّلَ بِهِمْ اِلَى اللّٰهِ لِاَنَّهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اِجْتَبَاهُمْ وَشَرَّفَهُمْ وَكَرَّمَهُمْ فَكَمَا نَفَعَ بِهِمْ فِىْ

الدُّنْيَا فَفِى الْاٰخِرَةِ اَكْثَرَمِمَّا فَمَنْ اَرَادَ حَاجَتَه فَلْيَذْهَبْ اِلَيْهِمْ وَيَتَوَسَّلَ بِهِمْ فَاِنَّهُمْ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَخَلْقِهِ اِلْخ *

অর্থঃ "মাজারের অলী যদি এই পর্যায়ের হয় যে, তাঁর কাছ থেকে বরকত লাভ করার আশা করা যায়, তাহলে প্রথমে নবী করিম (দঃ)কে আল্লাহর দরবারে উসিলা ধরবে। কেননা তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ও মূল উসিলা এবং তিনিই উসিলা ধরাকে বৈধ ও জায়েজ করেছেন। তারপর মাজারবাসী এবং কবরস্থানের অন্যান্য নেক বান্দা ও আউলিয়ায়ে কেরামগণকে মনোবাসনা পূরণ এবং গুনাহ মাগফিরাতের জন্য উসিলা বানাবে। তাদেরকে বেশী বেশী করে আল্লাহর দরবারে উসিলা বানাবে। কেননা, আল্লাহ সুব্‌হানাহু তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁদেরকে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে দুনিয়াতে যতটুকু কল্যাণ দান করেছেন, তার চেয়েও বেশী দান করবেন পরকালে। সুতরাং যে ব্যক্তির কোন মনোবাসনা থাকে, সে যেন অলীর মাজারে যায় এবং তাদেরকে উসিলা বানিয়ে যেন খোদার কাছে প্রার্থনা করে। কেননা তারা হচ্ছেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মাধ্যম স্বরূপ।" (মাদখাল - ইবনুল হাজ্ব।

১০নং দলীলঃ

সাইয়েদ মুহাম্মদ আব্‌দারী (রহঃ) মাদ্‌খাল গ্রন্থে লিখেনঃ

وَيَسْتَغِيْثُ بِهِمْ وَيَطْلُبُ حَوَائِجَهُ مِنْهُمْ وَيَنْجَزِمُ الْاِجَابَةَ بِبَرْكَتِهِمْ فَاِنَّهُمْ بَابُ اللّٰهِ الْمَفْتُوْحُ وَجَرَتْ سُنَّتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِىْ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ عَلٰى اَيْدِيْهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ *

অর্থ ঃ "যখন আল্লাহর কোন খাস বান্দার মাযারে উপস্থিত হবে, তখন খুব নম্রতা, অসহায়ত্ব, হীনতা ও দীনতার সাথে, খুশু-খুজুর সাথে তাঁদের সামনে দাঁড়াবে এবং তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, আপন মনোবাসনার জন্য তাঁদের নিকট সাহায্য চাইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তাঁদের বরকতেই দোয়া কবুল হবে। কেননা, তাঁরা হচ্ছেন খোদার রহমত প্রাপ্তির খোলা দরজা। তাঁদের মাধ্যমে এবং তাঁদের কারণেই মনোবাসনা পূরণ হওয়া আল্লাহরই প্রচলিত বিধান।" (মাদখাল - আব্‌দারী)।

১১নং দলীলঃ

অলী আল্লাহগণ দুনিয়া ও আখিরাতে ভক্তদের উপকার করে থাকেন এবং দুশমনদের ধ্বংস করেন। এ বিষয়ে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) এর গ্রন্থ "তাজকিরাতুল মাউতায়" উল্লেখ আছেঃ

"ارواح ایشاں از زمین وآسماں و بہشت ہرجاکه میخواہند میروند ودوستان ومعتقدان را دردنیا وآخرت مددگاری می فرمایند ودشمنان را ہلاك می سازند *

অর্থঃ "অলী আল্লাহগণ রূহানীভাবে জমিন, আসমান ও বেহেস্তের-যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন এবং বন্ধু ও ভক্তগণকে ইহকাল ও পরকালে মদদ ও সাহায্য করতে পারেন এবং দুশমনকে হালাক বা ধ্বংস করতে পারেন।" (তাজকিরাতুল মাউতা - পানিপথি)।

কাজী সানাউল্লাহ পানি পথি (রহঃ)-এর ফতোয়া মোতাবেক অলী আল্লাহগণ কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারেন। আর থানবী সাহেবের মতে অলীগণের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক। উভয়ের ওজন করা হলে কাজী সানাউল্লাহ (রহঃ) এর ওজন লক্ষগুণ বেশী হবে। – অনুবাদক।

১২নং দলীলঃ

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বাহ্‌জাতুল আসরারে বলেনঃ

مَنِ اسْتَعَانَ بِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ * وَمَنْ نَادٰى بِاِسْمِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ * وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ اِلَيْهِ عَزَّوَجَلَّ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهٗ (بَهْجَةُ الْاَسْرَارِ)

অর্থঃ "কোন লোক কঠিন বিপদে পড়ে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তার ঐ বিপদ দূর হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তি মসিবতে বা পেরেশানীতে পড়ে আমার নাম (ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ) বলে ডাক দিলে তার ঐ পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তি আমাকে উসিলা করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে সে আশাও পূরণ হবে।" (বাহজাতুল আসরার)

এখানে পরিষ্কারভাবে অলীগণের কাছে মদদ ও সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটাকে "ইসতিমদাদে রূহানী" বা রূহানী সাহায্য প্রার্থনা বলা হয়।

১৩নং দলীলঃ

ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) "মিজানুশ শরীয়ত" গ্রন্থে লিখেনঃ

"جَمِيْعُ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ يَشْفَعُوْنَ فِىْ اَتْبَاعِهِمْ وَيُلَاحِظُوْنَهُمْ فِىْ شَدَائِدِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ *

অর্থঃ "সমস্ত আইম্মায়ে মোজতাহেদীন তাঁদের অনুসারীদের বিপদে-আপদে দুনিয়া ও আখিরাতে, এমনকি কিয়ামতের দিনেও সুপারিশ করবেন।" (মিজানুশ শরীয়ত)

১৪নং দলীলঃ

ইমাম আব্দুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) তাঁর অন্য গ্রন্থ "লাওয়াকিহুল আন্‌ওয়ার" এ লিখেনঃ

সাইয়েদ মুহাম্মদ হানাফী (রহঃ) মৃত্যু শয্যায় বলেছেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ اِلٰى قَبْرِىْ وَيَطْلُبْ حَاجَتَهٗ اَقْضِيْهَا *

অর্থঃ "কারও কোন মনোবাসনা থাকলে সে যেন আমার কবরের পাশে এসে মনোবাসনা পূরণের জন্য ফরিয়াদ জানায়। আমি ঐ মনোবাসনা পূরণ করিয়ে দেবো"।(লাওয়াকিহুল আন্‌ওয়ার)।

১৫নং দলীলঃ

সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ফারগালী (রহঃ) বলেনঃ

"اَنَا مِنَ الْمُتَصَرِّفِيْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَمَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ اِلٰى قُبَالَةِ وَجْهِىْ وَيَذْكُرْهَا بِىْ اَقْضِيْهَا لَهٗ" *

অর্থঃ "আমি (ইবনে আহমদ) ঐ সমস্ত অলীগণের শ্রেণীভুক্ত- যারা কবরে থেকেও তাসাররূপ (ক্ষমতা প্রয়োগ) করতে পারেন। সুতরাং কারও কিছু বাসনা থাকলে সে যেন আমার সামনা সামনি এসে নিজের বাসনা বর্ণনা করে। আমি ঐ বাসনা পূরণ করিয়ে দেবো।"

১৬নং দলীলঃ

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ)-এর রূহানী ও ঐশী শক্তি সম্পর্কে মাওলানা আবদুর রহমান জামী (রহঃ) তার লিখিত "নাফাহাতুল্ উনছ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, মাওলানা রুমী (রহঃ) মৃত্যুকালে বলে গেছেনঃ

" از رفتن من غمناك مشو در حالتيكه باشيد مرا ياد كنيد تامن شمارا ممدباشم در حالتيكه باشم*

অর্থঃ "আমার (রুমী) প্রস্থানের পর তোমরা চিন্তিত হয়োনা। তোমরা যে অবস্থায়ই (বিপদে) থাক না কেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো সর্বাবস্থায়"। (নাফাহাতুল উনছ-জামী)।

১৭নং দলীলঃ

শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) "বোস্তানুল মোহাদ্দেসীন" গ্রন্থে সাইয়েদ আহমদ রাজুক (রহঃ)-এর আলোচনা করতে গিয়ে তার মুরীদানদের প্রতি তার একটি উক্তি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি আমার মুরীদানের পেরেশানী দূরকারী। যখন সময় তাদের প্রতি বিরূপ হয় এবং তাদের কোন তাকলীফ হয়- তখন তারা যেন 'ইয়া রাজুক' বলে আমাকে ডাকে। আমি তৎক্ষনাৎ (রূহানীভাবে) তাদের কাছে যাবো এবং তাদের সাহায্য করবো"। (পূর্ববর্তী অধ্যায়েও এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে-অনুবাদক)। (বোস্তানুল মোহাদ্দেসীন)।

মুসলমান ভাইয়েরা! আপনারা উপরে উল্লেখিত আপনাদের সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেয়েছেন যে, তোমরা খোদার প্রিয় বান্দাগণের কাছে, অলী-আল্লাহগণের কাছে নিজ মকসুদ পেশ করো। তাঁদেরকে আল্লাহর দরবারে মনোবাসনা পূরণের নিমিত্তে উসিলা ধরো। তাঁরা তোমাদেরকে রূহানীভাবে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের মনোবাসনা পূরণ করিয়ে দেবেন। তোমাদের গুনাহ্ মাপ করিয়ে দেবেন। তোমাদের কল্যাণ করবেন। বিপদ থেকে তোমাদেরকে বাঁচাবেন। আপনারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখুন-তাঁদের উসিলায় ও বরকতেই আপনাদের কাজ উদ্ধার হবে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালার বিধানই এই যে, অলী-আল্লাহগণের মাধ্যমে এবং তাদের হাতেই বান্দাদের হাজত পূর্ণ হয়। সৃষ্টির কর্ম তাদের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। শুধু তাই নয়। বরং আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ অলী-আল্লাহগণই বলছেন যে, "তোমরা পেরেশানীতে আমাদেরকে স্মরণ করো-ডাকো। আমরা তোমাদের সাহায্য করবো, তোমাদের বালা-মুসিবত ও পেরেশানী দূর করিয়ে দেবো। যখন তোমাদের কোন মনোবাসনা থাকে-তখন আমাদের কাছে আস। আমরা তোমাদের মকসুদ পূরণ করিয়ে দেবো। প্রয়োজন পূরণ করে দেয়া হবে।"

অলী আল্লাহগণের উপরোক্ত ঘোষণায় কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উল্লেখ নেই। রুজী-রোজগার, সন্তান-সন্ততি থেকে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ই উক্ত ঘোষণায় এসে গেছে। ঐ সব বিষয় খোদা প্রদত্ত শক্তিতে তাঁদের এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে। যদি আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে ঐ শক্তি ও এখতিয়ার না দিতেন, তাহলে তাঁরা কিভাবে

আপনাদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন? মানুষ তার ক্ষমতার বহির্ভূত কোন জিনিস দেয়ার প্রতিশ্রুতি কোন সময়ই দিতে পারেনা এবং একথাও বলতে পারেনা যে, "তোমরা আমাদের কাছে এসে চাও–আমরা দেবো"। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ঐ সব বিষয়ে ঐশী শক্তি দান করেছেন। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের এখতিয়ার তাঁদের দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের মাধ্যমেই ঐসব বিষয় সংঘটিত হচ্ছে। দ্বীনী ও দুনিয়াবী কাজ কর্মে তাঁদের ঐ ঐশী শক্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে। "এগুলো আল্লাহর দান। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। তিনি মহান দানের মালীক।"

উপরে বর্ণিত অলী-আল্লাহগণের ঘোষণা ও শিক্ষা তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে বলেন নি, বরং নবী করিম (দঃ)-এর বাণীই আপনাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন মাত্র এবং আপনাদের শুনায়ে দিয়েছেন। নবী করিম (দঃ)এরশাদ করে গেছেনঃ "তোমরা তোমাদের মনোবাসনা ও হাজত-আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নিকটতম বান্দা ও আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রার্থনা করো। তাঁরা তোমাদেরকে দেবেন, বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং উপকার সাধন করবেন"। যেমন পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একটি হাদীস তাবরানী ও ইব্‌নে সুন্নী বর্ণনা করেছেন, হাদীস খানা নিম্নরূপ ঃ

১৮নং দলীলঃ

اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا وَاَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ هُنَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَايَرَاهُمْ – رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضـ وَفِىْ رِوَايَةِ اِبْنِ السُّنِّىِّ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اِحْبِسُوْا *

অর্থঃ "তোমাদের কারও কোন জিনিস হারিয়ে গেলে এবং সাহায্যের প্রয়োজন হলে যদি ঐ জায়গায় কোন সাহায্যকারী বন্ধু না থাকে, তবে সে যেন একথা বলে,–" হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, (হারানো বস্তু উদ্ধারের জন্য) হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আমাকে সাহায্য করুন! কেননা, আল্লাহর এমন কিছু অদৃশ্য বান্দা রয়েছেন, যাদেরকে সে দেখতে পাচ্ছেনা"। ইব্‌নে সুন্নীর বর্ণনায় পশু হারানোর কথা আছে। তখন সে যেন এভাবে বলে,–"হে আল্লাহর বান্দাগণ! পশুটি ধরে রাখুন"! (হযরত উৎবা বিন গাজওয়ান (রাঃ) বর্ণিত তাবরানী শরীফের হাদীস)

উক্ত হাদীসে অদৃশ্য বান্দাদের (রিজালুল গায়েব) সাহায্য ও মদদ প্রার্থনার পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং থানবী সাহেব ও ওহাবী সম্প্রদায়ের এ ব্যাপারে শিরক ও কুফরের ফতোয়াবাজী স্বয়ং নবীজীর উপর বর্তায় না- কি?–অনুবাদক।

১৯নং দলীলঃ

তাবরানী আওসাতে হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসঃ

اُطْلُبُوا الْحَوَائِجَ اِلٰى ذَوِى الرَّحْمَةِ مِنْ اُمَّتِىْ تُرْزَقُوْا وَتَنْجَحُوْا

অর্থঃ "তোমরা আমার রহমদিল উম্মতের (আউলিয়ায়ে কেরাম) নিকট তোমাদের মকসুদের জন্য সাহায্য চাও। তাহলে তোমরা রিজিক প্রাপ্ত হবে এবং মকসুদও পূর্ণ হবে।"

২০নং দলীলঃ

তাবরানী কবিরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসঃ

اُطْلُبُوا الْخَيْرَ وَالْحَوَائِجَ مِنْ حِسَانِ الْوُجُوْهِ *

অর্থঃ "তোমরা তোমাদের মঙ্গল ও প্রয়োজনের জন্য উত্তম চেহারা বিশিষ্ট লোকদের নিকট (আউলিয়ায়ে কেরাম) সাহায্য প্রার্থনা করো"।

২১নং দলীলঃ

তাবরানী কবিরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসঃ

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى عِبَادًا اِخْتَصَّهُمْ بِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ اِلَيْهِمْ فِىْ حَوَائِجِهِمْ اُولٰئِكَ الْاٰمِنُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا)

অর্থঃ "আল্লাহর এমন কিছু খাস বান্দা রয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের হাজত পূরণের কাজে নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষ ঘাবরিয়ে গিয়ে তাঁদের কাছে মকসুদ পূরণের জন্য আসে। ঐসব খাস বান্দাগণ আল্লাহর আজাব থেকে নিষ্কৃতি লাভকারী।"। –তাবরানী কবির–হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সূত্রে।

পাঠকবর্গ! দেখুন! উপরে বর্ণিত ৫টি হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেছেন– "আল্লাহর কিছু খাস বান্দা মানুষের মঙ্গলের জন্য, হাজত পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত রয়েছেন। মানুষ তাঁদের কাছে হাজত পূরণের জন্য যাবে, মদদ ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য যাবে। তাঁরা তাদের মদদ করবেন, হাজত পূর্ণ করবেন। তোমরা ঐ সমস্ত রহমদিল ও উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট লোকদের নিকট আপন মকসুদ প্রার্থনা করো, মনোবাসনা চাও। তোমাদের হাজত ও মকসুদ পূর্ণ হবে। রুজী-রোজগার ও সন্তানাদি প্রার্থনা করলে তাঁদের উসিলায় পাবে"।

অথচ ওহাবী সম্প্রদায় বলে–কারও নিকট কিছু চাওয়া, রিজিক ও সন্তান ইত্যাদি প্রার্থনা করা, কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের এখতিয়ার প্রাপ্ত মনে করা–সবই সম্পূর্ণরূপে শিরক। তাদের কথায় বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত (দঃ) মানুষকে তাওহীদের পরিবর্তে শুধু শিরক শিক্ষা দেয়ার জন্যই আগমন করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)!

কোন কোন জাহেল ও অজ্ঞ ওহাবীরা হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছে যে, নবী করিম (দঃ) শুধু "ঐ সমস্ত জীবিত অলী-আল্লাহগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য বলেছেন- যাঁরা দৃষ্টির অগোচরে রয়েছেন। মৃত অলীগণের নিকট নয়"। তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত ও অজ্ঞতা প্রসূত। কেননা অলী-আল্লাহগণ প্রকৃত পক্ষে মরেন না। একস্থান থেকে অন্যস্থানে- ধ্বংসশীল পৃথিবী থেকে অবিনশ্বর আখেরাতে প্রস্থান করেন মাত্র এবং সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান। তাঁদের ক্ষেত্রে হায়াত–মউত এক সমান। তাঁরা দুনিয়াতে যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন– ইনতিকালের পরও সে ক্ষমতা অটুট থাকে, বরং আরও বৃদ্ধি পায়। ইমাম গাজ্জালী, শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী, শাহ্‌ আবদুল আজিজ দেহলভী, কাজী সানাউল্লাহ্‌ পানিপথি, আল্লামা মানাভী প্রমুখ বরেণ্য ইমাম ও ওলামাদের কালামের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

২২নং দলীলঃ

মৃত্যুর পর অলীগণের অবস্থা সম্পর্কে শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) আশিয়াতুল লোমআত শরহে মিশকাত-এ বলেনঃ

"اولیاء خدا نقل کرده شدند ازیں دار فانی بدار بقا زنده اند نزد پروردگار خود ومرزوق اند وخوشحال اند ومردم را ازاں شعور نیست" *

অর্থঃ "অলী আল্লাহগণ ধ্বংসশীল দুনিয়া ত্যাগ করে অবিনশ্বর আখেরাতে প্রস্থান করার পরও আল্লাহ-তায়ালার নিকট জীবিত থাকেন, রিজিক প্রাপ্ত হন ও খোশ হালাতে থাকেন। কিন্তু মানুষেরা এ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখেনা"। (আশিয়াতুল লোমআত)।

২৩নং দলীলঃ

অলী-আল্লাহ্‌গণের মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) "মিরকাতে" বলেনঃ

لَافَرْقَ لَهُمْ فِى الْحَالَيْنِ وَلِذَاقِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَايَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ

অর্থঃ "অলী–আল্লাহগণের হায়াত-মউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সর্বদা তাদের একই অবস্থা। (যেহেতু কারামত মৃত্যুর পরও অটুট থাকে)। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, আউলিয়ায়ে কেরাম প্রকৃতপক্ষে মরেন না। বরং তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রস্থান করেন মাত্র।" (মিশকাত)।

২৪নং দলীলঃ কুতুবুদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রঃ)-এর ঘটনাঃ

শাহ আবদুর রহিম দেহলভী (রহঃ)–যিনি আলমগীরী কিতাব রচয়িতাদের মধ্যে একজন। তিনি হযরত কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ)-এর মাজার নিয়মিত জিয়ারত করতেন। একদিন তার মনে খেয়াল আস্‌লো-হযরত বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ) কি আমাকে চিনেন? হঠাৎ বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ) শাহ আবদুর রহিমের সামনে উদভাসিত হয়ে ফারসী কবিতায় বললেনঃ

مرا زنده پندار چوں خویشتن * بجان آمدم گر تو آئی بتن *

অর্থঃ তোমার মতই জিন্দা আমি মনে রেখো ভাই,
স্বশরীরে এলে তুমি (আমি) প্রাণে এসে যাই"।
– বজমে জামশিদ।

২৫নং দলীলঃ

মৃত্যুর পরেও অলীগণের কারামত অটুট থাকার ব্যাপারে আল্লামা আবদুল গনি নাব্‌লুসী (ওস্তাদ-আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী) "হাদিকাতুন নাদিয়া" গ্রন্থে লিখেনঃ

"كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ اَيْضًا وَمَنْ زَعَمَ خِلَافَ ذٰلِكَ فَهُوَجَاهِلٌ مُتَعَصِّبٌ وَلَنَا رِسَالَةٌ فِىْ خُصُوْصِ اِثْبَاتِ الْكَرَامَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَلِىِّ *

অর্থঃ "আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সমূহ তাঁদের ইনতিকালের পরেও অটুট থাকে। যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম ধারণা করে, সে জাহেল-মূর্খ ও হঠকারী। আমি (নাব্‌লুসী) একটি পুস্তিকা খাস করে এই বিষয়ের প্রমাণের জন্য লিখেছি।" (হাদিকা)।

২৬নং দলীলঃ

মককা শরীফের মুফতী সৈয়দ জামাল মককী (রহঃ) নিজ ফতোয়ায় লিখেনঃ

مَرْجَعُ الْكَرَامَاتِ اِلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ اِلٰى اَنْ قَالَ وَلِاَوْلِيَاءِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَرَامَاتِ اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

অর্থঃ "আল্লামা আইনী – যিনি হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ উলামাদের মধ্যে সর্বশেষ –তিনি বলেনঃ যখন একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অলী-আল্লাহগণের কারামতের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর কুদ্‌রত, তখন তাঁদের জীবদ্দশা ও মৃত অবস্থার মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। ---- এরপর তিনি বলেনঃ সমস্ত উলামাগণের ঐক্যমতে নবী করিম (দঃ)-এর মো'জেজা বেশুমার। নবী করিম (দঃ)-এর মোজে'জার মধ্যে অলীগণের জীবদ্দশায় ও ইনতিকাল পরবর্তী সময়ে কারামত প্রকাশ পাওয়া নবীজীরই একটি অন্যতম মো'জেজা। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে"। – ফতোয়ায়ে জামাল মককী।

২৭নং দলীলঃ

'ফতোয়ায়ে জামাল মককী'-তে শাইখুল ইসলাম শিহাবুদ্দীন রমলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

"مُعْجِزَاتُ الْاَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ لَاتَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ *

অর্থঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের মো'জেজা ও আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাত তাঁদের ইনতিকালের পর বন্ধ হয় না। বরং তা বাকী থাকে।"

২৮নং দলীলঃ

চারজন ঐশী শক্তি সম্পন্ন অলী-আল্লাহ সম্পর্কে শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) 'আশিয়াতুল লোমআত ফি শরহে মিশকাত-এ উল্লেখ করেনঃ

"یکے از مشایخ عظام گفته که دیدم چهار کس را از مشایخ تصرف می کنند در قبور خود - مانند تصرفهائے شاں درحیات خود یابیشتر ازاں - شیخ معروف وعبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنهما ودوکس دیگر را از اولیاء شمرد - ومقصود حصرنیست - انچه خود دیده ویافته است گفته*

অর্থঃ "জনৈক উচ্চপদস্থ শাইখ হতে বর্ণিত আছেঃ তিনি বলেছেন যে, আমি এমন চারজন বিশিষ্ট অলী-আল্লাহকে পেয়েছি-যারা মৃত্যুর পরেও নিজেদের কবরে থেকে ঐরূপ শক্তিই ব্যবহার করেন-যা করতেন জীবদ্দশায় অথবা বলা যায়- তার চেয়েও বেশী। তন্মধ্যে একজন হলেন শেখ মারুফ এবং অন্যজন হলেন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুমা)। অন্য দু'জন আউলিয়ার নামও ঐ শেখ বর্ণনা করেছেন। তবে এর দ্বারা শক্তি প্রয়োগকারী অলী-আল্লাহগণের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা ঐ শেখের উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনি যা দেখেছেন ও পেয়েছেন- তাই বলেছেন। (আশিয়াতুল লোমআত)।

উল্লেখ্য যে, 'শেখ মারুফ' দ্বারা তিনি শেখ আলী কোরায়শীকে বুঝিয়েছেন। আর অন্য দু'জনের নাম 'মিরকাতে' উল্লেখ করা হয়নি। "বাহ্‌জাতুল আসরার" প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) ঐ দু'জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের একজনের নাম হলো-শেখ আকিল (রহঃ) এবং অন্যজনের নাম হলো- হায়াত ইবনে কয়েস হাররানী (রহঃ)। এই চারজনের কারামত মৃত্যুর পরও চালু থাকতে দেখেছেন ঐ সম্মানীত শেখ।

২৯নং দলীলঃ

"তাকমীলুল ঈমান" গ্রন্থে শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেনঃ

"تصرف بعض اولیاء درعالم برزخ دائم وباقی ست - وتوسل واستمداد بارواح مقدسه ایشاں ثابت ومؤثر - وامام حجة الاسلام محمد غزالی رحمة الله علیه گوید که ہرکه در حیات ولی بوے توسل وتبرک جویند بعد از موتش نیز تواں جست - واولیاء را ابدان متکثره مثالیه نیز بود که بداں ظهور نمایند وامداد وارشاد طالبان کنند - ومنکر را دلیل وبرهان براں کار آں نیست *

অর্থঃ "কোন কোন অলী-আল্লাহগণের 'তাসাররুফ' বা ঐশী শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা মৃত্যুর পরও আলমে বরজখে (কিয়ামত পর্যন্ত) সদা সর্বদা বিদ্যমান থাকে। তাঁদের উসিলা গ্রহণ করা ও তাঁদের পবিত্র আত্মার নিকট সাহায্য চাওয়া দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং ফলপ্রসূ প্রমানিত হয়েছে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেনঃ "জীবদ্দশায় যেসব অলী-আল্লাহদের নিকট সাহায্য ও বরকত চাওয়া

জায়েজ-মৃত্যুর পরেও তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ও বরকত চাওয়া জায়েজ"। অলী-আল্লাহ্‌গণের নিজের অনুরূপ শত সহস্র মেছালী শরীর ও সুরত ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। ঐ শরীর দ্বারা তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আত্ম প্রকাশ করেন এবং ভক্তদেরকে সাহায্য ও হেদায়েত করতে পারেন। বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এসব অলৌকিক কাজের বিরুদ্ধে কোন দলীল ও অকাট্য প্রমাণ নেই।" (তাকমীলুল ঈমান)

৩০নং দলীলঃ

মক্‌তুবাতে ইমামে রাব্বানী প্রথম খন্ড ২১৭নং মকতুবে উল্লেখ আছেঃ

(অনুবাদঃ) "এমন তকদীর যা মুব্‌রাম অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়রূপে লাওহে মাহ্‌ফুজে লিখা রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর এলেমে আছে যে, বিশেষ অবস্থায় পরিবর্তন হতে পারবে। এই ধরনের তক্‌দীরের মধ্যেও হস্তক্ষেপ تَصَرُّفْ করার অলৌকিক শক্তি আল্লাহ্ তায়ালা গাউসুল আ'জম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) কে দান করেছেন"। (সূত্র ঃ মাসিক তাবলীগ মে'১৯৭০ সংখ্যা – সম্পাদক মাওঃ আজিজুর রহমান নেছারাবাদী – কায়েদ হুজুর)

বিঃ দ্রঃ যে সব বিরুদ্ধবাদী লোক আউলিয়ায়ে কেরামের অলৌকিক ক্ষমতা ও কারামাতকে অস্বীকার করে এবং তাদের অন্তরে আগুন ধরে যায়, শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) ও মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রাঃ)-এর উপরোক্ত ইবারতের দ্বারা তাদের 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' পড়েছে। দেহলভী সাহেব পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, একই সময়ে একজন অলী-আল্লাহ মিছালী শরীর ধারণ পূর্বক বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, ভক্তদেরকে সাহায্য করতে পারেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পারেন। মোজাদ্দেদ সাহেবের এবারতে বলা হয়েছে -তকদীর পরিবর্তনের ক্ষমতা গাউসে পাককে দান করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আধুনিক থিউসফী চার প্রকার শরীর স্বীকার করে। যথাঃ ফিজিক্যাল বডি, ইথিক্যাল বডি, কস্যাল বডি ও এষ্ট্রাল বডি। ওহাবী সম্প্রদায়ের ধোঁকা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক রাখুন। (বিশ্বনবী দেখুন) তাকদীর পরিবর্তনের ক্ষমতা গাউছে পাককে আল্লাহ দান করেছেন। অথচ থানবী ও মৌদুদী সাহেব এবং তাদের অনুসারীরা (গোলাম আজম, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী গং) বলছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মোখতার নয়। (মৌদুদীর লন্ডনের ভাষণ)।

সপ্তম অধ্যায়

কারও নামে রোজা রাখা প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کے نام کاروزہ رکھنا (شرك وكفر ہے)

"কারও নামে রোজা রাখা শিরক ও কুফর"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধনঃ

কারও নামে রোজা রাখার অর্থ হলো-উক্ত রোজার সাওয়াব তাঁর রুহে পাকে পৌছিয়ে দিয়ে তাঁর দোয়া ও সান্নিধ্য লাভের আশা করা। কোন মুসলমান কাউকে খোদা মনে করে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে রোজা রাখেনা। কাউকে খোদা মনে করে ইবাদতের নিয়তে তার নামে রোজা রাখলে ঐ রোজা রাখা অবশ্যই শিরক হবে। কোন মুসলমান কি এরূপ করে? কখনই না। তাহলে শিরক হবে কেন? এটা প্রতারণা ও ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রকৃতপক্ষে কারও নামে নফল রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া, নফল সদকা করা, নফল হজ্ব করা, নফল কোরবানী করা-এক কথায় নফল ইবাদাত করা-চাই ইবাদতে বদনী হোক আর ইবাদতে মালী হোক-সব রকমের নফল ইবাদাত করা জায়েজ। আর ফরজ ইবাদাত বা নফল ইবাদাত নিজে করে তার সওয়াব জীবিত ও মৃত যে কাউকে দান করা-উভয়ই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে এবং শরীয়ত মতে জায়েজ ও বৈধ। কোরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও কিয়াছ- এই চার দলীলের দ্বারা তা প্রমাণিত। শিরক তো দূরের কথা, মকরুহও নয়। ৮টি দলীল নিম্নে পেশ করা হলো।

১নং দলীলঃ

রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ اَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَاَنْ تَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ وَاَنْ تَصَدَّقَ لَهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيْ وَغَيْرُهٗ)

অর্থঃ "তোমার পিতা-মাতার প্রতি তাদের ইনতিকালের পর সদ্ব্যবহারের একটি সুরত হলো এই যে, তুমি তোমার নিজের নামাজের সাথে তাদের জন্যও কিছু নামাজ

(নফল) পড়বে, তোমার নিজের রোজার সাথে তাদের জন্যও কিছু (নফল) রোজা রাখবে এবং তোমার নিজের সদ্‌কার সাথে তাদের জন্যও কিছু (নফল) সদকা করবে"। – দারুকুত্‌নী ও অন্যান্যগণ।

২নং দলীলঃ

এক মহিলা দরবারে নববীতে এসে আরজ করলেনঃ আমার মায়ের উপর দু'মাসের রোজা বাকী রয়েছে। আমি মায়ের পক্ষে ঐ রোজা কাজা করলে জায়েজ হবে কি? নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করলেন– হাঁ! আরবী হাদীস নিম্নরূপঃ

كان على امى صوم شهرين أفيجزئ عن أصوم عنها ؟

قال نعم (رواه مسلم)

অর্থ ঃ "আমার মায়ের উপর দু'মাসের রোজা বাকী রয়ে গেছে। আমি তার পক্ষে উক্ত রোজা আদায় করলে যথেষ্ট হবে কি? নবী করিম (দঃ) বললেনঃ হাঁ!" (মুসলিম শরীফ)

৩নং দলীল ঃ

ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত উম্মুল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেনঃ

من مات وعليه صيام صام عنه وليه (رواه البخارى)

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উপর যদি রোজা বাকী থেকে যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারী অলী বা অভিভাবক তার পক্ষে ঐ রোজা আদায় করবে"। বোখারী শরীফঃ সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)।

বিঃ দ্রঃ খালেছ ফরজ এবাদতে বদনী–যেমন নামাজ ও রোজা অন্য কেউ আদায় করলে ফরজ আদায় হবেনা। এটা সর্ব সম্মত মস্‌আলা বরং এগুলোর কাফ্‌ফারা দিতে হবে। তাই উপরোক্ত হাদীস তিনটির মর্ম ও ব্যাখ্যা মোহাদ্দেসীনগণ এভাবে করেছেন যে, "তোমরা নামাজ ও রোজা রেখে কেবল তার সওয়াব পিতা-মাতাকে দান করতে পারবে এবং এই পদ্ধতি জায়েজ"। তাদের নামে রোজা রাখা ও নামাজ পড়া এবং ঐ সময়ে তাদের নিয়ত করা বৈধ। উদাহরণ স্বরূপঃ নামাজ-রোজার শুরুতে বলবে যে, আমি অমুকের নামে নামাজ পড়ছি বা রোজা রাখছি। এগুলোর সওয়াব তার রূহে পৌছুক। অথবা নিজের জন্য নামাজ পড়ে অথবা রোজা রেখে পরে এগুলোর সওয়াব অন্যকে দান করে দেবে। উভয় প্রকারই জায়েজ আছে। তাহলে শিরক হওয়ার কারণ কি?

৪নং দলীলঃ

মোল্‌তাকা এবং অন্যান্য সকল ফেকাহর কিতাবে উল্লেখ আছেঃ

"وللانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره فى جميع العبادات عند اهل السنة والجماعة *"

অর্থঃ "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে (চার মাযহাব). মানুষ আপন সর্ব প্রকারের ইবাদাতের সওয়াব অন্যকে দান করতে পারে"।

৫নং দলীলঃ

"দোররে মোখতার" নামক ফেকাহ্‌ গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

الاصل ان كل من اتى بعبادة ماله ان يجعل ثوابه لغيره

অর্থঃ "মূলনীতি হচ্ছে– "প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন সব ধরনের ইবাদতের সওয়াব অন্যকে দান করতে পারবে"।

৬নং দলীলঃ

"রদ্দে মোহ্‌তার বা ফতোয়ায়ে শামী" দোররে মোখতারের উপরোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

اى سواء كانت صلوة او صوما او صدقة او قرأة اوذكرا

او طوافا او حجا او عمرة او غير ذلك *

অর্থঃ "সব ধরনের ইবাদাতের অর্থ হচ্ছে–নামাজ, রোজা, সদকা, ক্বেরাত, জিকর, তাওয়াফ, হজ্‌, ওমরা ইত্যাদি"। ঐ সবগুলোর সওয়াব অন্যকে দান করতে পারবে।

৭নং দলীলঃ

ফতোয়ায়ে শামীর অন্যত্র উল্লেখ আছেঃ

صرح علماؤنا بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره

صلوة او صوما او صدقة وغيره كذا فى الهداية – وفى

البحر من صام او صلى او تصدق وجعل ثوابه لغيره من

الاموات والاحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند اهل السنة والجماعة كذا فى البدائع وبهذا علم انه لافرق بين ان يكون المجعول له ميتا اوحيا والظاهر انه لافرق بين ان ينوى عند الفعل لغيره او يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لاطلاق كلامهم وانه لا فرق بين الفرض والنفل - (رد المحتار)

অর্থঃ "আমাদের হানাফী মাজহাবের উলামাগণ পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, মানুষ নিজ আমলের সওয়াব অন্যকে দান করতে পারেন – যেমন নামাজ, রোজা, সদ্‌কা ইত্যাদি। হেদায়া গ্রন্থে এ মত উল্লেখিত হয়েছে। বাহ্‌র নামক গ্রন্থে আছে–কেউ নামাজ পড়ে, রোজা রেখে, সদকা করে এর সওয়াব জীবিত বা মৃত যে কোন ব্যক্তিকে দান করে দিলে জায়েজ হবে এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে সে সওয়াব ঐ ব্যক্তির নামে পৌছে যাবে। বাদায়ে' নামক গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। হেদায়া ও বাদায়ে' গ্রন্থদ্বয়ের মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সওয়াবপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবিত বা মৃত উভয়ই হতে পারে। এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। একথাও জানা গেল যে, কাজ করার সময়ই অন্যকে দান করার নিয়তে ঐ আমল করা হয়েছে। অথবা আমল করার পর অন্যকে এর সওয়াব দান করা হবে। এই উভয় ধরনের নিয়তই বৈধ। কেননা, হেদায়া ও বাদায়ে গ্রন্থে উলামাগণ আগে বা পরের কোন শর্ত ছাড়াই সওয়াব দানের কথা বলেছেন। আর একটি বিষয়ও পরিস্কার হয়ে গেল যে, ফরজ অথবা নফল ইবাদাত–উভয় ইবাদাতের সওয়াবই দান করা যেতে পারে। এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল" – ফতোয়ায়ে শামী।

পাঠকবর্গকে ইনসাফের সাথে বিবেচনা করতে বলবো। যখন অন্যের নিয়ত করে রোজা রাখা হয় এবং এরূপ নিয়ত করে যে, এর সওয়াব অমুকের রূহে পৌছুক–অথবা নিজের জন্য আমল করে পরে তার সওয়াব অন্যকে দান করা হয়–তখন উভয় সুরতই জায়েজ। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাহলে অন্যের নামে রোজা রাখাকে শিরক বলা হলো কেন? দ্বিতীয় সুরতকে তো থানবী সাহেব শিরক বলেননি। এটা কি হঠকারিতা ও প্রতারণা নয়? কারও নামে রোজা রাখাই যদি শিরক হয়- তাহলে তো নিজের নামেও রোজা রাখা শিরক হওয়া উচিত ছিল। থানবী সাহেব শুধু অন্যের নামে নিয়ত করে রোজা রাখাকে শিরক বলেছেন। অন্যের নামে নামাজ পড়াও তো তাহলে শিরক হবে? কিন্তু থানবী সাহেব শুধু রোজার কথা খাস করে উলেখ করেছেন কেন? নামাজ বা

অন্যান্য ইবাদাতের কথা তিনি চেপে গেছেন। অথচ ফোকাহায়ে কেরাম সমস্ত ইবাদাতের সওয়াব দান করাই জায়েজ বলেছেন। যেমন- ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি চুপ থেকে থানবী সাহেব অন্যান্য ইবাদাতের সওয়াব দান করার বিষয় স্বীকার করে থাকেন–তাহলে রোজাকে শিরক বললেন কোন্‌ দলীলের বলে? কেননা, নামাজের যে হুকুম- রোজারও একই হুকুম। অন্যান্য ইবাদাতেরও একই হুকুম। ফরজের যে হুকুম, নফলেরও একই হুকুম। যা উপরে প্রমাণিত হয়েছে।

৮নং দলীলঃ (অনুবাদক)

কোন নেক কাজ করে পূর্বে বা পরে এর সওয়াব যে অন্যকে দান করা যায়–তার দুটি প্রমাণ অতিরিক্ত দলীল হিসাবে পেশ করা হলো। যথাঃ

(ক) মেশকাত শরীফে আছে–হযরত সাআদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ)-এর মা ইনতিকাল করার পর তিনি নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন–ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা ইনতিকাল করেছেন। এখন কোন্‌ জিনিস তাঁর জন্য উপকারী হবে? হুজুর (দঃ) বললেনঃ একটি কুপ খনন করে তোমার মায়ের নামে দান করে দাও এবং বলো "হাজা লি উম্মে সাআদ"। অর্থাৎ এই কুপটি সাআদের (রাঃ) মায়ের নামে।

(খ) হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) তাপসী রমনী ছিলেন এবং তাবেয়ী ছিলেন। তিনি প্রতি রাত্রে নবী করিম (দঃ)-এর নামে এক হাজার রাকআত নফল নামাজ পূর্বেই নিয়ত করে আদায় করতেন। এভাবে তিনি রহমাতুল্লীল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করতেন (রাবেয়া জীবনী গ্রন্থ)।

উপরোক্ত ৮টি দলীল দ্বারা প্রমানিত হলো–কারও নামে রোজা রাখা শিরক নয়। এমন কি হারাম বা মকরূহও নয়। বরং জায়েজ ও উত্তম। ইহাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা এবং শরীয়তের বিধান। এটাকে শিরক বলা উদ্দেশ্যমূলক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বেহেস্তী জেওর মুসলমানী বৈধ কাজকে শিরক বলে মুসলমানকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। থানবীর শেরেকী ফতোয়া থেকে আল্লাহ পানাহ দিন।

অষ্টম অধ্যায়

কাউকে সিজ্‌দা করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کوسجدہ کرنا (شرك وكفر ہے)

"কাউকে সিজদা করা শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধনঃ

শরীয়তে সব ধরনের সিজদাই হারাম। কিন্তু সব সিজ্‌দা শিরক্ নয়। সুতরাং সব ধরনের সিজদাকে ঢালাও ভাবে শিরক বলা থানবী সাহেবের মারাত্মক ভুল। কেননা, সিজদা দুই প্রকার। যথাঃ (১) ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা, (২) তাজিমী সিজদা করা। প্রথম সিজদা শিরক এবং দ্বিতীয় সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ। কিন্তু শিরক নয়। শ্রেণীবিন্যাস না করে সকল সিজদাকে শিরক বলা মারাত্মক ভুল। সুতরাং থানবীর এরূপ বলা উচিত ছিল- "ইবাদতের নিয়তে কাউকে সিজদা করা শিরক"।

তাজিমী সিজদা : (পূর্ব জামানায় জায়েজ ছিল)

আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণকে আদম (আঃ) কে তাজিমী সিজদা করার জন্য নির্দেশ করেছিলেন। "তোমরা আদমকে সিজদা করো"। যদি উক্ত সিজদা শিরক হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা কখনও উক্ত শিরকের নির্দেশ দিতেন না এবং শয়তানকেও নির্দেশ অমান্য করার কারণে অভিশপ্ত ও কাফির বলে আখ্যায়িত করতেন না। কেননা শিরক হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম গুনাহ- যা ক্ষমার অযোগ্য। এরূপ শিরকের হুকুম আল্লাহ দিতে পারেন না।

তাজিমী সিজদা যদি শিরক হতো, তাহলে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা কেন তাঁকে সম্মানের সিজদা করলেন? আল্লাহ তায়ালা উক্ত ঘটনা প্রশংসার সাথেই কোরআনে বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا

অর্থাৎ "তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সম্মানে সিজদায় পতিত হলো"। সুতরাং বুঝা গেল যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সিজদা ও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সিজদা ইবাদতের সিজদা ছিলনা বরং তাজিমের সিজদা ছিল। আর তাজিমের উদ্দেশ্যে সিজদা করা আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তে বৈধ ও জায়েজ ছিল। কিন্তু শরীয়তে মোহাম্মদীতে উক্ত তাজিমী সিজদাকে মানুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। ইহাই বিশুদ্ধতম মত। অধিকাংশের মতও ইহাই।

তাজিমী সিজদা শিরক না হওয়ার কতিপয় দলীলঃ

১ম দলীলঃ

তাফসীরে গারায়েবুল কোরআন-এ উল্লেখ আছেঃ

وَاَصَحُّ الْاَقْوَالِ اَنَّ السُّجُوْدَ كَانَ بِمَعْنٰى وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَلٰكِنَّ لَاعِبَادَةً بَلْ تَكْرِمَةً وَتَحِيَّةً كَالسَّلَامِ *

অর্থঃ "বিশুদ্ধতম মত হলো- ফিরস্তাদের সিজদার অর্থ হচ্ছে কপাল ঠেকানো। কিন্তু তা ইবাদতের জন্য ছিলনা। বরং সালামের ন্যায় সম্মান ও তাজিমের উদ্দেশ্যে ছিল"।

২নং দলীলঃ

"বেনায়াতুল কাজী ওয়া কিফায়াতুর রাজী আলা তাফসীরিল বায়জাবী" গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

"وَالْاَكْثَرُ عَلٰى اَنَّهٗ كَانَ مُبَاحًا اِلٰى عَصْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" *

অর্থঃ "অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে উক্ত তাজিমী সিজ্‌দা প্রথা আমাদের প্রিয় নবী (দঃ)-এর যুগ পর্য্যন্ত বৈধ বা মোবাহ্ ছিল"। (শিরক ছিলনা)।

৩নং দলীলঃ

রদ্দুল মোহতার বা ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছেঃ

"اِخْتَلَفُوْا فِىْ سُجُوْدِ الْمَلَائِكَةِ قِيْلَ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى آدَمَ تَشْرِيْفًا كَاِسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَقِيْلَ بَلْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالْاِكْرَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (تاتارخانية) قَالَ فِىْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَالصَّحِيْحُ الثَّانِىْ وَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً لَهٗ بَلْ تَحِيَّةً وَاِكْرَامًا وَلِذَا اِمْتَنَعَ عَنْهُ اِبْلِيْسُ وَكَانَ جَائِزًا فِيْمَا مَضٰى كَمَا فِىْ قِصَّةِ يُوْسُفَ *

অর্থঃ "ফিরিস্তাদের সিজদার প্রকৃতি সম্পর্কে তাফসীর বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন- সিজদা ছিল আল্লাহর জন্য এবং মুখ ছিল হযরত আদম (আঃ)-এর দিকে। যেমন আমরা ক্বিবলামুখী হয়ে খোদার উদ্দেশ্যে সিজদা করি। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেছেন-বরং সিজদা আদম (আঃ)-কেই করা হয়েছিল-কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাজিম ও সম্মান-ইবাদত নয়। তারপর পরবর্তীকালে তা মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়- নবী করিম (দঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে। নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেন," আমি যদি কাউকে অন্য কারও উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকেই নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য"। (তাতার খানিয়া)। তাবয়ীনুল মাহারিম গ্রন্থে বলা হয়েছে-উপরের দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়টিই বিশুদ্ধ ও সহিহ্ অর্থাৎ আদম (আঃ)-এর সিজদাটি ছিল সম্মান ও তাজিমের উদ্দেশ্যে-ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। একারণেই ইবলিশ সম্মান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। এই সম্মানী ও তাজিমী সিজদা অতীত শরীয়তে বৈধ ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাই এর প্রমাণ"।

ফয়সালাঃ

মোদ্দা কথা হলো- তাজিমী সিজদা আমাদের শরীয়তে হারাম এবং কবিরা গুনাহ্। কিন্তু শিরক কিছুতেই নয়। যদি থানবী সাহেব এই সিজদাকেও শিরক বলতে চান- যেমন তার রচিত শব্দ প্রমাণ করে - তাহলে তার লিখিত হিফজুল ঈমান-এর কথার সাথে বিরোধ সৃষ্টি হবে- যা দূর করা কষ্টসাধ্য হবে। সুতরাং বেহেস্তী জেওরের মধ্যে অবশ্যই "ইবাদতের সিজদা"এই শর্তটি জুড়ে তাজিমী সিজ্‌দাকে শিরক থেকে বাদ দিতে হবে এবং এটাকে হারাম ও কবিরা গুনাহ্ বলে ঘোষণা দিতে হবে-যেমনটি তিনি দিয়েছেন হিফজুল ঈমান পুস্তিকায়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, তাজিমী সিজদা আমাদের শরীয়তে হারাম। কিন্তু কোন মতেই শিরক নয়। পূর্ববর্তী শরিয়তের ঘটনা আমাদের শরীয়তের জন্য একক দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে যেখানে নবী করিম (দঃ) নিষেধ করেছেন এবং তিনি কোন সাহাবীর সিজদা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, সেখানে জায়েজের প্রশ্নই আসেনা। আমাদের উদ্দেশ্যও তাই। তাজিমী সিজদাকে শিরক বলা যাবেনা। হারাম বলতে হবে এবং তাজিমী সিজদাকারী গুনাহগার হবে। কাফির বা মুশরিক হবেনা। ঢালাওভাবে শিরক বলা অন্যায়। অনেকে পদচুম্বন বা কদমবুচিকে সিজদা বলে। এটা মারাত্মক অন্যায়। কারণ কদমবুচি হচ্ছে সুন্নাত।

৪নং দলীলঃ

"ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া"-তে তাজিমী সিজদা সম্পর্কে উল্লেখ আছেঃ

"وَمَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَايُكْفَرُ وَلٰكِنْ يَّأْثَمُ لِارْتِكَابِه الْكَبِيْرَةَ هُوَ الْمُخْتَارُ*

অর্থঃ "যে ব্যক্তি বাদশাহ্কে তাজিমী সিজ্‌দা করবে অথবা তার সামনে ভূমি চুম্বন করবে, সে কাফির হবেনা। কিন্তু কবিরা গুনাহের কারণে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। ইহাই সর্ব সম্মত গৃহীত মত"।

৫নং দলীলঃ

তাজিমী সিজ্‌দার শরয়ী হুকুম সম্পর্কে "খাজানাতুর রিওয়ায়াত" গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرَ مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَىْ سُلْطَانٍ اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهٗ فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ اٰثِمًا مُّرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ "*

অর্থঃ "ফকিহ আবু জাফর বলেছেন- কোন ব্যক্তি বাদশাহ কিংবা আমীরের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করলে বা তাকে সিজদা করলে যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে করে থাকে, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু কবিরা গুনাহ সংঘটিত করার কারণে সে নিশ্চয়ই গুনাহ্গার হবে"। সুতরাং তাজিমী সিজদা করা কবিরা গুনাহ্।

৬নং দলীলঃ

তাজিমী সিজদা সম্পর্কে রদ্দুল মোহ্‌তার (শামী) গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

قَالَ الزَّيْلَعِىْ وَذَكَرَ صَدْرُ الشَّهِيْدِ اَنَّهٗ لَايُكْفَرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهٗ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ"

অর্থঃ "জায়লায়ী বলেছেন- সদ্রুশ শহীদ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধরনের সিজদার কারণে সিজদাকারীকে কাফির বলা যাবেনা। কেননা, সে এর দ্বারা তাজিম ও সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছে। বরং সে গুনাহ্গার হবে"। আমাদের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু থানবী সাহেব এটাকেও শিরক বলে ফেলেছেন-যা ভুল। (লা-হাওলা.....)। উপরোক্ত ৬টি দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হলো- তাজিমী সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ। কিন্তু শিরক নয়। থানবী সাহেব গুনাহের কাজকে শিরক বলে অন্যায়ভাবে গুনাহগার মুসলমানকে মুশরিক বানিয়ে ছেড়েছেন।

নবম অধ্যায়

কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کےنام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاواچڑھانا (شرك ہے)

"কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়া শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধনঃ

"নিয়ত অনুযায়ী সকল কাজের ফলাফল পাওয়া যায়"। হাদীস শরীফে নবী করিম (দঃ)- হিজরত সম্পর্কে উক্ত বাণী এরশাদ করেছেন। যদি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাহলে সে দুনিয়া বা স্ত্রী-ই পাবে। হিজরতের সওয়াব থেকে সে মাহরুম থাকবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান পীর- বুজুর্গ বা মা-বাপের নামে তাঁদের রূহে সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে কোন পশু ছেড়ে যদি এই নিয়ত করে যে, যার মনে চায় সে এই পশু নিয়ে যাক। অথবা কোন পীর- বুজুর্গের নেয়াজ বা পিতা-মাতার ফাতেহার নিয়তে যদি কোন পশু ছেড়ে দেয়-যাতে সে তাড়াতাড়ি মোটা তাজা হয়। এরপর জবেহ করে খানা তৈরী করে ঐ বুজুর্গের নামে নেয়াজ তৈরী করা হয় বা পিতা-মাতার ফাতেহা দেয়া হয় এবং সওয়াব রেছানী করা হয়। অথবা পশুটি জবেহ করে ঐ গোস্ত ফকির-মিস্‌কিনকে বিলিয়ে দেয়া হয়- যাতে এর সওয়াব ঐ বুজুর্গ বা পিতা-মাতার রূহে পৌছে- তাঁহলে কোনই দোষ বা ক্ষতি নেই। শিরক তো দূরের কথা নাজায়েজ হওয়ারও কোন কারণ নেই। কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়ার কারণে ঐ পশুর গোস্ত হারামও হবেনা। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামাদের মতে প্রত্যেক লোকই নিজের নেক আমলের সওয়াব জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে দান করতে পারে এবং এই সওয়াব জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নামে লিখা হয়। যেমন- শামী ও অন্যান্য কিতাবের বরাতে ৩য় অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোরআন মজিদে সূরা মায়েদা ১০৩ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "বাহিরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসিলাহ্ ও হা'ম-এই চার প্রকারের জন্তুকে আল্লাহ হারাম করেননি। বরং কাফিরগণই ঐ ধরনের পশু নিজেদের জন্য নিজেরা হারাম করে আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছে"। আর এক প্রকারের পশু-যাকে জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা প্রতিমা ও দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিত এবং এটা খাওয়া হারাম মনে করতো। এটাকে তারা সায়েবাহ বলতো। আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ এটাকে (ছেড়ে দেয়া) হারাম করেননি"। সুতরাং কোন পীর বুজুর্গের নামে কোন পশু ছেড়ে দিলে সেটার গোস্ত হারাম হবেনা। "বিস্‌মিল্লাহ আল্লাহ আকবার" বলে জবাই করা সব পশুকেই কোরআন মজিদে হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন। ওহাবী সম্প্রদায় দেব দেবীও প্রতিমার সাথে পীর বুজুর্গগণকে তুলনা করে তাদের নামে (রূহে পাকে) সওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া পশুকে "সায়েবাহ" সাব্যস্ত করেই এই প্রথাকে শিরক বলেছে। এটা তাদের মনগড়া ও বে দলীলী কথা।

পীর বুজুর্গ বা পিতা-মাতা বা অন্য কারো নামে ছেড়ে দেয়া পশু যে হালাল-এ সম্পর্কে নিম্নে দলীল পেশ করা হলো।

১নং দলীলঃ

দোররে মোখ্‌তার গ্রন্থে মোখ্‌তারাত গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"سَيَّبَ دَابَّتَهُ وَقَالَ هِيَ لِمَنْ اَخَذَهَا لَمْ يَأْخُذْهَا مِمَّنْ اَخَذَهَا" *

অর্থঃ "কেহ যদি সদকার নিয়তে পশু ছেড়ে দিয়ে বলে- "এটা যার ইচ্ছা নিয়ে যাক"। তাহলে সে ঐ পশু ফিরিয়ে আনতে পারবেনা। যে ধরেছে-সেই এটার মালিক হয়ে যাবে। (পশু ছেড়ে দেয়া এবং অন্যের নিয়ে যাওয়া উভয়ই জায়েজ)।

২নং দলীলঃ

শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) "রেছালা নযর ও জবায়েহ্" গ্রন্থে নিম্ন ফতোয়া দিয়েছেনঃ

اگر شخصے بزے را خانہ پرور کند تاگوشت او خوب شود - اورا ذبح کردہ وپختہ فاتحہ غوث اعظم رضی اللہ تعالے عنہ خواندہ بخوراند خللے نیست" *

অর্থঃ "কোন ব্যক্তি যদি ছাগল গৃহে লালন-পালন করে, -যাতে গোস্ত প্রচুর হয়। এরপর ঐ ছাগল বা পশু জবেহ করে ও রান্না করে গাউসুল আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুর নামে ফাতেহা দেয় এবং খায়, তাহলে তাতে কোনই দোষ নেই"। -রেসালা নযর ও জাবায়েহ্।

এখানে গাউসুল আজমের নামে ও তাঁর উদ্দেশ্যে ফাতেহা করার জন্য ছাগল যত্ন সহকারে লালন পালন করে জবেহ করে ফাতেহা বা নেয়াজ দিয়ে ঐ গোস্ত খাওয়া জায়েজের কথা বলা হয়েছে।

৩নং দলীলঃ

ওহাবী নেতা ইসমাঈল দেহলভী "তাক্‌রীরে জবেহ্" নামক ফার্সী গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"وہمچنیں اگر گاؤ زندہ بنام سید احمد کبیر را بدہد بطوریکہ نقد میدہند نیز رواست وگوشت آن حلال"........"واگر ہمیں طور نذر برائے اولیاء گزشتگان (رضی اللہ عنہم اجمعین) کند رواست

অর্থঃ "অনুরূপভাবে যদি জীবিত গরু সাইয়েদ আহমদ কবির (রহঃ)-এর নামে দান করে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয়, তবে এটাও জায়েজ এবং ঐ পশুর গোস্তও হালাল হবে"। ----- অন্যত্র আছেঃ "আর যদি কোন ইন্‌তিকালপ্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম আজমাঈন)-এর নযর-নেয়াজের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, তাহলেও জায়েজ হবে"। (তাক্‌রীরে জবেহ্‌)

৩নং দলীলে ওহাবীদের ভারতীয় প্রধান নেতা ইসমাঈল দেহলভী নিজেই ফতোয়া দিচ্ছেন যে, সৈয়দ আহমদ কবির অথবা যে কোন অতীত অলীর নামে নযর ও নেয়াজ স্বরূপ গরু দান করলে তার গোস্ত সকলের জন্যই হালাল হবে। কেননা এটা নফল সদ্‌কা-যা সওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। এরপর থানবী সাহেবের "শিরক" ফতোয়ার মূল্য আছে কি?

বিঃদ্রঃ থানবী সাহেব বেহেস্তী জেওরে উর্দ্দূ ভাষায় আর একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেটা হলো-"চড়ওয়াহা চড়হানা" অর্থাৎ অলীগণের দরবারে পেশকৃত নযর। তিনি এ ধরনের হাদিয়া ও নযর-নেয়াজকেও "শিরক" বলেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে "মান্নত" প্রসঙ্গে এর জবাব দেয়া হবে- ইন্‌শা আল্লাহ!

দশম অধ্যায়

কারও নামে "মানত" প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کے نام کی منت ماننا (شرک و کفر ہے)

"কারো নামে মানত করা শিরক ও কুফর"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্‌ বা সংশোধনঃ

প্রকৃত পক্ষে মানত, নযর, নেয়াজ ও চড়ওয়াহা-এই চারটি শব্দ একই অর্থ বোধক। এর মধ্যে 'নযর' শব্দটি আরবী। এটির ধরন ও ব্যবহার দুই প্রকারের। একটি হলো 'শরয়ী নযর' অন্যটি হলো 'উরফী নযর'।

শরয়ী নযর ঃ শরয়ী নযর বা মানত-এর সংজ্ঞা হলোঃ

"اِيْجَابُ مَالَايُوْجَبُ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ" *

অর্থ ঃ মূলতঃ যা ওয়াজিব নয়, তা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া। যেমন রোগমুক্তির জন্য গরু ছাগল মানত করা। এ ধরনের মানত একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস। অন্য কারও জন্য এ মান্নত করা হারাম ও বাতিল।

উরফী নযরঃ

কোন বস্তু কোন সম্মানীত ব্যক্তি বা কোন বুজুর্গের খেদমতে পেশ করাকে উরফী নযর বা প্রথাগত মানত ও হাদিয়া বলা হয়। অর্থাৎ- কোন সম্মানীত ব্যক্তি বা বুজুর্গ ব্যক্তির সন্তুষ্টি ও দোয়া অর্জনের লক্ষ্যে তাকে খোশ করা বা তার শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে কোন বস্তু হাদিয়া স্বরূপ, উপঢৌকন স্বরূপ, তাবারুক স্বরূপ তার খেদমতে পেশ করা বা পেশ করার ওয়াদা করাকে নযর বলে। নযরে উরফী যে কোন লোকের জন্য করা যেতে পারে।

মাওলানা শাহ্‌ রফিউদ্দীন দেহ্‌লভী (শাহ ওয়ালি উল্লাহর ছেলে) আপন গ্রন্থ-"নযর ও মাজারাত"-এ নযর বা মানতকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেনঃ

"لفظ نذر مشترك ست در نذر شرعى ونذر عرفى - نذر شرعى اِيْجَابُ غَيْرِ وَاجِبٍ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ ست وعرفى انچه پيش بزرگان مى برند ونياز مى گويند" *

অর্থ : "নযর' শব্দটি দুই অর্থ বহনকারী বা দ্ব্যার্থবোধক। এক অর্থ হলো নযরে শরয়ী এবং আর এক অর্থ হলো নযরে উরফী। নযরে শরয়ী বলা হয়- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে- ওয়াজিব নয় এমন জিনিসকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া। আর নযরে উরফী হলো-কোন বুজুর্গের খেদমতে কিছু বস্তু পেশ করা। এটাকে নেয়াজও বলা হয়"।

একটি আল্লাহর নামে। অন্যটি বান্দার নামে। প্রথমটি ওয়াজিব। দ্বিতীয়টি মোস্তাহাব ও মোবাহ্। প্রথমটি মিছকিনের হক্ব। দ্বিতীয়টি সকলের হক্ব। কোন জ্ঞানবান মুসলমানই উরফী নযর বা প্রথাগত মানতকে শরয়ী নযর বা ওয়াজিব মানত বলে মনে করেনা এবং করতেও পারেনা। কেননা, কোন বুজুর্গের খেদমতে বা সম্মানীত ব্যক্তির সামনে কোন জিনিস ইবাদত বা তাকাররুবের নিয়তে পেশ করা হয়না। এরূপ পেশ করার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের নিয়তও কেউ করেনা। উদাহরণ স্বরূপঃ নিত্যনৈমিত্তিক মানুষ একথা ব্যবহার করে থাকে যে, হাকিম সাহেবকে নযরানা দেয়া হয়েছে। উকিল সাহেবকে নযরানা দেয়া হয়েছে। নওয়াব সাহেব, রাজা সাহেব প্রমুখের সামনে নযরানা পেশ করা হয়েছে। অথবা একথা বলা হয় যে, ডাক্তার সাহেব। ভাল করে চিকিৎসা করুন। সুস্থ হলে উপযুক্ত নজরানা দেয়া হবে। উকিল সাহেব। ভাল করে মামলার তদবীর করুন। মামলায় জিত্‌লে এই পরিমাণ টাকা নজরানা স্বরূপ দেয়া হবে। এগুলো মূলত ফিস। কিন্তু ভদ্র ভাষায় সৌজন্যমূলক শব্দ হিসাবে 'নজরানা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এটা বৈধ। অথচ আল্লাহর শানেও একই শব্দ ব্যবহার করলে সেটাকে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় এবং তা সদ্‌কায় পরিণত হয়। তখন তা মিসকিনের হক্ব হয়ে যায়।

বাদশাহর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে, ক্ষমতা গ্রহণের বার্ষিকী পালনকালে, আমির উমারা ও আমাত্যবর্গ যা কিছু পেশ করেন-তাকে পরিভাষায় নযর বা নযরানা বলা হয়। কৃষকগণ পূর্বকালে নূতন জমিদারকে যে উপঢৌকন দিত-তাকেও নযর বা ভেট বলা হতো। অনুরূপভাবে বাংলা ও উর্দূ ভাষায় নেয়াজ শব্দটি বহুলভাবে প্রচলিত। যেমনঃ আপনার নেয়াজমান্দ, আপনার প্রতি আমার নেয়াজ, অমুকের প্রতি আমার কোন নেয়াজ নেই-ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কেরামের খেদমতে যা কিছু পেশ করা হয়, অথবা তাঁদের নামের উপর যা কিছু সদকা করা হয়-তাকেও নযর, নেয়াজ মানত ইত্যাদি বলা হয়। তাদের মাজারে যা কিছু পৌছানো হয়- উর্দূ ভাষায় এগুলোকে চড়ওয়াহা বলা হয়। থানবী সাহেব এই মানত, চড়হাওয়াহা- ইতাদিকেই শিরক ও কুফর বলেছেন। এটা কত বড় বে-ইনসাফী যে, যে সব শব্দ জায়েদ, বকর, ওমর, জমিদার, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির ক্ষেত্রে বলা যায়েজ, সেগুলোকেই অলী আল্লাহগণের সম্পর্কে বললে শিরক বলা হবে। মোদ্দা কথা হলো- নযর, নেওয়াজ, মানত; চড়হাওয়াহ্ অলী-আল্লাহগণের জন্য নিঃসন্দেহে যায়েজ ও বৈধ। দলীল সমূহ ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১নং দলীলঃ

ওহাবীদের ইমাম ইসমাঈল দেহলভী অলীগণের নামে মানত সম্পর্কে তাক্‌রীরে জাবায়েহ্ গ্রন্থে লিখেনঃ

اگر شخصے نذر کند کہ فلاں حاجت من بر آید اینقدر نیاز حضرت سید احمد کبیر بکنم رواست واگر ہمیں قدر گاؤ را نذر کند نیز رواست چرا کہ مقصودش گوشت ست وبس وہمچنیں اگر گاؤ زندہ بنام سید احمد کبیر کسے را بدہد بطوریکہ نقد دہند نیز رواست وگوشت آں حلال .... واگر ہمیں طور نذر برائے اولیاء گزشتگان کند رواست اینقدر فرق ست کہ سبب انتقال از عالم دنیا بعالم برزخ منتفع بنقد وجنس وطعام نمے خواہند شد بلکہ ثواب صرف آں اللہ تعالی بار واح مطہرہ ایشاں میرساند پس احوال ایشاں درحالت حیات وبعد ممات برابرست : ...."اگر نذر کند بشرط برآمدن حاجت خود گاؤ دو سالہ فربہ نیاز حضرت غوث اعظم خواہم کرد - بس حکم ایں مثل حکم طعام ست - اگر نذر بطریق حسن ست ہیچ خللے نہ واگر قبیح ست فعلش حرام ست وحیوان حلال "........." اگر شخصے بزے خانہ پرور کند تاگوشت او خوب شود - اوراذبح کردہ وبختہ فاتحۂ حضرت غوث اعظم خواندہ بخور اند خللے نیست" *

অর্থঃ "যদি কোন ব্যক্তি মানত করে যে, আমার অমুখ মকসুদ হাসিল হলে আমি সৈয়দ আহমদ কবির (রহঃ) (আরব)-এর জন্য নেয়াজ দেবো, তা হলে মানত দুরস্ত হবে। আর যদি ঐ পরিমান গরুর গোস্ত মানত করে, তাহলেও দুরস্ত হবে। কেননা, উদ্দেশ্য হচ্ছে গোস্ত। অনুরূপভাবে যদি জীবিত গরুর মানত করে সৈয়দ আহমদ কবির (রহঃ)-এর নামে এবং কাউকে উহা দিয়ে দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে-তাহলেও দুরস্ত আছে এবং উহার গোস্ত হালাল হবে"। ---- অন্যত্র আছেঃ "আর অনুরূপভাবে যদি কোন অতীতকালের ইনতিকালপ্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে নেয়াজ দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাও দুরস্ত হবে। শুধু পার্থক্য হলো এইযে, ইন্‌তিকালের কারণে তাঁরা দুনিয়া হতে আখেরাতে চলে যান। তখন তাঁরা নগদ অর্থ, কোন বস্তু বা খাদ্য চান না। বরং আল্লাহ তায়ালা শুধু ঐগুলোর সওয়াব ঐসব পবিত্র আত্মা বুজুর্গদের রূহে পৌছিয়ে দেন। তাঁদের অবস্থা জীবিতকালে যেমন ছিল-ইনতিকালের পরেও তেমনিই থাকে"।---

অন্যত্র বলেনঃ "আর যদি এই শর্তে মানত করে যে, 'আমার অমুক মকসুদ পূর্ণ হলে আমি দু'বৎসরের মোটা তাজা একটি গরু হযরত গাউসুল আজম (রাঃ)-এর জন্য নেয়াজ দেবো, তাহলে এর বিধান হলো- খানা খাওয়ানোর বিধানের মতই জায়েজ। মানত যদি উত্তম পন্থায় (ইসালে সওয়াবের নিয়তে) করা হয়, তাহলে উত্তম এবং নির্দোষ, আর যদি খারাপ পন্থায় (ইবাদতে গাইরুল্লাহ) করা হয়, তাহলে খারাপ ও নাজায়েজ। এ অবস্থায় শুধু কাজটি হারাম হবে; কিন্তু পশুর গোস্ত হালাল হবে"। (কেননা জবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়েছে)। — অন্যত্র বলেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি একটি ছাগল যত্নকরে লালন-পালন করে খুব মোটা তাজা করে এবং গোস্তওয়ালা বানায় এবং ঐ ছাগল জবেহ করে এবং রান্না করে হযরত গাউসুল আজমের নামে ফাতেহা দিয়ে নিজেরা খায়, তাহলেও বৈধ হবে। এতে কোন দোষ হবে না"। (তাকরীরে জাবায়েহ-ইসমাঈল দেহলভী)।

পাঠকবর্গ! ওহাবী সম্প্রদায়ের ইমাম ও পেশোয়া ইসমাইল দেহলভী আউলিয়ায়ে কেরামের নযর-নেয়াজ ও মানতকে ইসালে সওয়াবের নিয়তে জায়েজ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং এতে কোন দোষ নেই- বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। অথচ তার অনুসারীরা ঐ শব্দগুলোর উপর শিরক ও কুফরীর ফতোয়া লাগাচ্ছে। আউলিয়ায়ে কেরামের নামে মানত, নজর-নেয়াজ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ওয়াস্তেই মানত। কিন্তু এর শুধু সওয়াব পৌছে অলীগণের রূহে পাকে।

২নং দলীলঃ

"তাফসীরাতে আহমাদী-তে (মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) কৃত) উল্লেখ আছেঃ

النذر لغير الله حرام ونذر الاولياء مأول بان النذر لله

অর্থঃ "নযরে শরয়ী আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে হারাম। কিন্তু আউলিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে নজর বা মানতের অর্থ হলো- মানত হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আর এর সওয়াব হচ্ছে অলীগণের উদ্দেশ্যে"। (থানবী সাহেব উর্দু ইবারতে এক অংশ (নযরে শরয়ী) উল্লেখ করেছেন এবং শিরক বলেছেন। শেষের অংশ (নযরে উরফী) বাদ দিয়েছেন-যার কারণেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে-অনুবাদক)।

৩নং দলীলঃ

আল্লামা আবদুল গনি নাব্‌লুসী (আল্লামা শামীর ওস্তাদ) "কাশফুন্‌ নূর" গ্রন্থে নযরে উরফী বা প্রচলিত মানত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নিম্নরূপেঃ

"نذر الدراهم والدنانير للاولياء بان تصرف على فقرائهم المجاورين جائز فى نفسه لان النذر فيه مجاز عن العطية كما قالوا فى الهبة للفقراء ههنا صدقة وفى الصدقة على الغنى ههنا هبة فالعبرة للمقاصد فى الشرع دون الالفاظ فان النذر انما هو مخصوص بالله تعالى - فاذا استعمل فى غيره كمن قال الرجل لك على عشرة دراهم ان شفا مريضى ونحوه ثم قال نذرت لفلان كذا كان وعدا منه بذلك وهومجاز عن الهبة ان كان ذلك الرجل غنيا وعن الصدقة ان كان فقيرا فكيف يقول عاقل بحرمة قول الانسان لولي من اولياء الله بعد الموت ان شفا الله مريضى لك عندى كذا فان اهل الولاية اولى فى هذا المعنى من غيرهم وان كانوا امواتا فان القائل يعلم ان ذلك يصرف فى مصالح الخدم لذلك الولي وللفقراء فيجعل ذلك وعدا وعطية تصحيحا لقول المؤمنين واما اصرار

بَعْضِ النَّاسِ عَلٰى تَحْرِيْمِ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ
فَمُوْجِبُهٗ عَدَمُ الْحَيَاءِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّ الْحَرَامَ فِيْ مُقَابَلَةِ
الْفَرْضِ يُحْتَاجُ فِيْ ثُبُوْتِهٖ اِلٰى دَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ" (كَشْفُ النُّوْرِ) *

অর্থঃ "অলী-আল্লাহগণের নামে টাকা পয়সা, দিরহাম-দিনার মানত করে ঐ টাকা মাজারে বসবাসকারী ফকির মিছকিনদের জন্য ব্যয় করা জায়েজ। কেননা, এ মানতের দ্বারা এক্ষেত্রে শুধু দান করা বুঝানো হয়েছে। দান সকলের জন্য জায়েজ। যেমন ফেকাহ বিশারদগণ বলেছেন যে, গরীব লোকদেরকে কোন জিনিস হেবা বা দান হিসাবে দিলেও তার নাম হবে সদ্‌কা, আর ধনী লোকদেরকে কোন জিনিস সদকা হিসাবে দিলেও তার নাম হবে হেবা বা দান। অর্থাৎ পাত্রভেদে তার নাম হবে হেবা বা দান। একই জিনিসের বিভিন্ন নাম ও রূপ হয়। তদ্রূপ মানতের বেলায়ও পাত্রের প্রভেদ প্রযোজ্য। আল্লাহর জন্য মানত করলে নাম হবে নজরে ওয়াজিব এবং অলীদের জন্য মানত করলে এর নাম হবে হাদিয়া বা দান-যা প্রত্যেকে ভোগ করতে পারবে। কেননা, শরীয়তে শুধু শব্দার্থই বিবেচ্য নয় বরং শব্দের ভিতরের মর্মার্থ বা অন্তর্নিহিত অর্থই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটাকে পরিভাষায় উরফ বলা হয়। (মর্মার্থের উপর নির্ভর করেই ফতোয়া হয়ে থাকে-অনুবাদক)। "নযর" শব্দটি মূলতঃ আল্লাহর সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের জন্য যখন ব্যবহৃত হয়, যেমন কেউ কোন ব্যক্তিকে বললোঃ "আমার রোগ ভাল হয়ে গেলে আপনাকে দশ টাকা বা এত টাকা দেওয়া আমার উপর ধার্য করলাম"। এরপর বললোঃ "আমি অমুককে এত টাকা দেয়ার নযর বা মানত করেছি"। শেষোক্ত বাক্যটির মধ্যে নযর দ্বারা প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা বুঝায়। এই নযর বা মানতের অর্থ পাত্র ভেদে স্থির হবে। যদি ঐ ব্যক্তি গরীব হয়, তাহলে এর অর্থ হবে সদকা। আর ধনী হলে নযরের অর্থ হবে হেবা বা দান।

উপরের নীতিমালা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি কোন ইন্‌তিকাল প্রাপ্ত অলীকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, "যদি আল্লাহ তায়ালা আমার রোগ ভাল করে দেন, তাহলে আমি আপনার উদ্দেশ্যে বা খেদমতে এত টাকা দেবো"। তাহলে কোন আকলমন্দ ব্যক্তি কি এই লোকটির উক্ত কথাকে হারাম বল্‌তে পারে? কখনও না। কেননা, অন্যদের তুলনায় অলী-আল্লাহগণ অধিক উত্তম ও অগ্রগণ্য। মানতকারী লোকটির ভাল করেই জানা আছে যে, এই টাকা অলী খাবেনা। খাবে তার দরবারের ফকির ও মিসকিনগণ এবং খাদেমগণের কল্যাণমূলক কাজেই তা ব্যয় করা হবে। সুতরাং অলীর নামের মান্নতের এ টাকা ফকির মিসকিনদের জন্য হবে সদকা এবং খাদেমগণের জন্য হবে হাদিয়া। এতে করে পূর্বের মূলনীতির বাস্তবায়ন হবে। কোন কোন লোক অলীগণের নামে মানত করাকে অকাট্য দলীল ছাড়াই হারাম বলে কঠোরতা করে থাকে। এর মূল কারণ হচ্ছে-আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। কারণ হারাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়

ফরজের বিপরীতে। অর্থাৎ ফরজ প্রমাণ করতে হলে যেমন অকাট্য দলীলের প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে হারাম প্রমাণ করতে হলেও অকাট্য দলীলের প্রয়োজন হয়"। (কাশফুন নূর)।

অলীগণের মানতকে হারাম বলার জন্য কোন অকাট্য দলীল নেই। বরং মোস্তাহাব বলার পক্ষে যথেষ্ট দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং শিরক ও কুফর ফতোয়া দানের জন্য আল্লাহর দরবারে থানবী সাহেবের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। অকাট্য দলীল ছাড়া এরূপ উক্তি করা- আল্লামা নাবলুসীর মতে নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার কাজ। আল্লামা নাবলুসী (রহঃ)-এর উপরোক্ত সূক্ষ্ম আলোচনাটি ফেকাহ্ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীতিমালার খেলাফ কোন ফতোয়া দেয়া অজ্ঞতারই পরিচায়ক। (অনুবাদক)।

৪নং দলীলঃ

অলী-আল্লাহগণের নামে নযর-নেয়াজ জায়েজ কিনা-এমন এক প্রশ্নের জবাবে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান বেরেলভী (রহঃ) বলেনঃ (অনুবাদ)ঃ

"মুসলমানগণ আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহে ইসালে সওয়াবের নিয়তে তাঁদের জন্য নযর-নেয়াজ করে থাকে। এটা তাদের জন্য এবাদতের নিয়তেও করা হয়না এবং তাদেরকে মাবুদ বা এবাদতের উপযুক্ত বলেও মনে করা হয় না। এই নযর নযরে শরয়ী নয় বরং নযরে উরফী। বাদ্‌শাহ বা উলামাগণের দরবারে যা কিছু উপঢৌকন পেশ করা হয়, উহাকে পরিভাষায় বা প্রচলিত ভাষায় নযর-নেয়াজ বলা হয়। নেয়াজ শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন প্রচলিত ভাষায় বলা হয় "আমি আপনার নেয়াজমান্দ"। এটা সাধারণের বেলায়ও বলা যেতে পারে। ------- যে কাজ আল্লাহ, আল্লাহর প্রিয় রাসুল এবং নায়েবে রাসুলগণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য উপলক্ষ্য মাত্র-যেমন আল্লাহর জন্য নামাজ, রাসুলের জন্য দরূদ এবং অলী আল্লাহগণের জন্য নযর ও নেয়াজ- সে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ অর্থাৎ "আল্লাহ এবং তার রাসুলকে রাজী রাখাই কর্তব্য, যদি তারা মোমেন হয়ে থাকে"। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغٰى بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْهَدِيَّةَ يُبْتَغٰى بِهَا
وَجْهُ الرَّسُوْلِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
بْنِ عَلْقَمَةَ) *

অর্থঃ "সদ্‌কার দ্বারা আল্লাহর রেজামন্দি লাভ করাই উদ্দেশ্য এবং হাদিয়া দ্বারা নবী করিম (দঃ)এর সন্তুষ্টি ও আপন মকসুদ পূরণ করাই আসল লক্ষ্য। সুতরাং অলীগণের নামে নযরও নেয়াজ মান্নত করা জায়েজ। (তাবরানী শরীফ)।

একাদশ অধ্যায়

কবর বা পবিত্র স্থানের চতুষ্পার্শ্বে নিছবতি তাওয়াফ বা চক্কর দেয়া প্রসঙ্গ

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا (شرک وکفر ہے) *

"কারোও কবর বা কোন স্থানের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা শিরক ও কুফর" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধনঃ

তাওয়াফ শব্দের অর্থ কোন জিনিসের চতুর্দিকে চক্কর দেয়া। এটা সাধারণভাবে শিরক নয়। কিন্তু থানবী সাহেব আমভাবে এই চক্কর দেয়াকে শিরক বলেছেন। এটা তাঁর ভুল। বরং সহিহ্ কথা হলো এই যে, খানায়ে কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করা শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত। ঐরূপ ইবাদতের নিয়তে অন্য কোন স্থানের বা কোন মাযারের চতুর্দিকে তাওয়াফ করলে শিরক হবে। কিন্তু তরিকতের লাইনে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির মাযারের চতুর্দিকে চক্কর দিয়ে ফয়েজ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিছবত বা আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঘুরাফেরা করলে তা বৈধ ও জায়েজ। অনুরূপভাবে বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে কবরের চতুর্দিকে ঘুরাও বৈধ। এটাকে মক্কা শরীফের তাওয়াফের সাথে তুলনা করে শিরক বলা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, দুটোর উদ্দেশ্য পৃথক। একটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত। অন্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করা ও ফয়েজ-বরকত লাভ করা। তরিকতের পীর মাশায়েখগণ থেকে 'কাশ্‌ফে কুবুর'-এর জন্য এ ধরনের আধ্যাত্মিক তাওয়াফ বা নিছবতের তাওয়াফের বিবরণ পাওয়া যায়।

আর এক ধরনের তাওয়াফ আছে-যার দ্বারা কোন জিনিসকে বরকত দানকরা হয়- এধরনের তাওয়াফ বা চককর স্বয়ং নবী করিম (দঃ) থেকেই প্রমাণিত। যেমনঃ

১ম দলীলঃ

বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, মদিনা শরীফের আনসার সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরন করেন। আমার পিতার উপর ঋণের বোঝা ছিল। আমি শুকনো খেজুর দিয়ে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে চাইলাম। কিন্তু ঋণ দাতারা শুকনা খেজুর গ্রহণ করতে অস্বীকার

করলেন। আমি নবী করিম (দঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা জানালাম। নবী করিম (দঃ) খেজুর একত্রিত করে তাঁকে সংবাদ দিতে বললেন। আমি বাড়ী গিয়ে খেজুর স্তুপ দিয়ে হুজুর (দঃ) কে সংবাদ দিলাম। তিনি এসে ঐ জমাকৃত খেজুরের স্তুপের চতুর্দিকে তিনবার তাওয়াফ করলেন বা চক্কর লাগালেন। আরবী এবারত বা হাদীস এরূপঃ

وَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ *

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) তশরীফ এনে উক্ত স্তুপের চতুর্দিকে তিনবার তাওয়াফ করে উহার বড় স্তুপটির উপর বসে পড়লেন"।

এরপর তিনি ঋণ দাতাগণকে ডেকে এনে রাজী করালেন এবং ওজন করে দিতে লাগলেন। সকলের ঋণের পরিমাণ খেজুর আদায় হয়ে গেলো। কিন্তু পূর্বে যত খেজুর ছিল সে পরিমাণ খেজুরই অবশিষ্ট রয়ে গেলো"। (বোখারী শরীফ)।

এতে প্রমাণিত হলো- বরকত দানের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু বা স্থানের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা জায়েজ। তাওয়াফ শব্দটি হাদীসেই উল্লেখ রয়েছে।

২নং দলীলঃ

খাজনাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে মোলতাকাত গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ আছেঃ

وَاِنْ كَانَ قَبْرُ عَبْدٍ صَالِحٍ وَيُمْكِنُهٗ اَنْ يَّطُوْفَ حَوْلَهٗ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَعَلَ ذٰلِكَ *

অর্থঃ "কবর যদি নেক বান্দার (অলী-আল্লাহ) হয় এবং তাঁর কবরের চারদিকে তাওয়াফ করা (চককর দেয়া) সম্ভব হয়, তা হলে তিনবার তাওয়াফ করবে"। এতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হলো- মাজারের চতুর্দিকে নিছবতের তাওয়াফ করা বৈধ।

৩নং দলীলঃ

জুরকানী শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা জুরকানী "কামেল" গ্রন্থের হাওয়ালা উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ "ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদ ওলামায়ে কেরামগণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে তার নিম্নের মন্তব্যের কারণে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। হাজ্জাজের মন্তব্যটি ছিল নিম্নরূপঃ

اَنَّهٗ رَاَى النَّاسَ يَطُوْفُوْنَ حَوْلَ حُجْرَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا يَطُوْفُوْنَ بِاَعْوَادٍ وَرِمَّةٍ *

অর্থঃ "হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (তার গভর্ণর পদে থাকাকালীন) কিছু লোককে নবী করিম (দঃ)এর রওজা মোবারকের চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে দেখে মন্তব্য করে বসলো যে, এ লোকগুলি কিছু লাকড়ী ও গলিত দেহের তাওয়াফ করছে"। (নাউজু বিল্লাহ)

সতর্কতাঃ

হাজ্জাজের রাজত্বকাল ছিল ৬৮ হিজরী থেকে ৮৬ হিজরী পর্যন্ত আনুমানিক। সে যুগটি ছিল কিছু সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনের যুগ। হাজ্জাজ যেসব লোককে রওজা মোবারকের চতুর্দিকে তাওয়াফরত দেখেছিল- তাঁরা হয়তো সাহাবী, তাবেয়ী অথবা নিদেনপক্ষে তাবেয়ীন নিশ্চয়ই হবেন। এর নীচে হতে পারেনা। তাঁদের এই তাওয়াফ নিশ্চয়ই বৈধ ছিল। হাজ্জাজ তাঁদের এই ক্রিয়া কলাপ দেখে রওজা পাকের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক উক্তি করার কারণে উলামাগণ তাকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন। যদি কোন স্থানের তাওয়াফ করা শিরক হতো- তাহলে উক্ত সাহাবী বা তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ীন নিশ্চয়ই উক্ত তাওয়াফ করতেন না। এটা করা তাঁদের পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপার। এবার থানবী সাহেবই বলুন-তাঁদের রওজা মোবারক তাওয়াফটি কোন্ ধরনের শিরক ছিল? আর ঐ যুগের সল্‌ফে সালেহীনগণ ঐ তাওয়াফকে শিরক এবং তাওয়াফকারীগণকে মোশ্‌রেক বললেন না কেন? থানবী সাহেব কি করে চট করে এধরনের তাওয়াফকে বিনা বাছ-বিচারে শিরক বলে আখ্যায়িত করলেন? তিনি যদি সাধারনের জন্য এরূপ করা অনুচিত বলতেন এবং খাস খাস লোকদের জন্য পথ খোলা রাখতেন, তাহলেও কিছুটা মানা যেতো। কিন্তু তিনি গড়ে শিরক বলে হাজার হাজার সাহাবী ও তাবেয়ীনকে মোশরেক ও কাফের বানিয়ে ফেললেন। সাহাবীগনও বাদ পড়েন নি। পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখুন- থানবী কোন স্তরের লোক!

৪নং দলীলঃ

স্বয়ং আশরাফ আলী থানবী সাহেব তাঁর "হিফজুল ঈমানের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় কবর তাওয়াফের বৈধতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

হিফজুল ঈমানের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় জনৈক ব্যক্তি আশরাফ আলী থানবী সাহেবকে প্রশ্ন করেছেন যে, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব "কাশ্‌ফে কুবুর" অর্থাৎ কবরবাসীর সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগের নিয়ম এভাবে বলেছেনঃ

وبعده ہفت کرہ طواف کند ودراں تکبیر بخواند وآغاز از
راست کند وبعده طرف پایاں رخسار نهد *

অর্থঃ শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেছেনঃ "অতঃপর কবরের চতুর্দিকে সাত চককর তাওয়াফ করবে। এই তাওয়াফের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিবে। ডানদিক থেকে তাওয়াফ শুরু করবে এমনভাবে- যেন জিয়ারতকারীর মুখ কবরবাসী অলীর পায়ের দিকে থাকে"।

অতঃপর প্রশ্নকারী উপরোক্ত এবারত লিখে থানবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন- কবরের চতুর্দিকে উক্ত তাওয়াফ বৈধ কিনা? থানবী সাহেব হিফজুল ঈমানের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় এ প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ "এ প্রকারের তাওয়াফ শরীয়তী পরিভাষার তাওয়াফ নহে-যার দ্বারা ইবাদত ও সান্নিধ্য মকসুদ হয় এবং এ ধরনের তাওয়াফই শরীয়তে নিষিদ্ধ। বরং যে তাওয়াফের কথা শাহ সাহেব বলেছেন-সেটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থে তাওয়াফ। অর্থাৎ কবরের চতুর্দিকে ঘুরে কবরবাসীর সাথে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করাই এর উদ্দেশ্য। কবরবাসীর পক্ষ হতে বরকত লাভ করাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এধরনের শাব্দিক তাওয়াফের ঘটনা হযরত ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে"। হিফজুল ঈমানের মূল ইবারত নিম্নরূপঃ

"یہ طواف اصطلاحی نہیں ہے جو کہ تعظیم و تقرب کے
لئے کیاجاتا ہے - اور جس کی ممانعت نصوص شرعیہ
سے ثابت ہے - بلکہ طواف لغوی ہے یعنی محض اسکے ارد
گرد پہرنا واسطے پیدا کرنے مناسبت روحی کے صاحب قبر
کے ساتہ اور لینے فیوض کے - اسکی نظیر حضرت جابر
بن عبد اللہ کے قصے میں وارد ہے"

পাঠকবর্গের মনযোগ আকর্ষণ করে বলছি- থানবীসাহেব "হিফজুল ঈমানে" কবরের তাওয়াফ সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহর ফতোয়া স্বীকার করে-জায়েজ ফতোয়া দিয়ে আবার বেহেস্তী জেওরে লিখেছেন- "কবর বা স্থানের তাওয়াফ করা শিরক"। এটা তাঁর পরস্পর বিরোধী মতামত নয় কি? মানুষ কোন্‌টি মান্‌বে? হিফজুল ঈমান কয়জনে পড়ে। বেহেস্তী জেওরই অধিকাংশ লোক পড়ে থাকে। একটি স্বীকৃত বৈধ কাজকে শিরক বলে ঘোষণা দিয়ে মুসলমানকে মুশরিক বানানো কি উচিত? স্ববিরোধী মতামত শুধু মানুষকে বিভ্রান্তই করে। সঠিক পথের সন্ধান এতে পাওয়া যায় না এসব বিভ্রান্তিমূলক ফতোয়াবাজী থেকে সতর্ক থাকাই উচিত। (অনুবাদক)।

দ্বাদশ অধ্যায়

কারো সম্মুখে মাথা নত করা বা মূর্তির মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা- প্রসঙ্গ

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا (شرک ہے)

"কারো সামনে ঝুকে পড়া বা অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা শিরক"(১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধনঃ

কারো সম্মুখে সম্মানের উদ্দেশ্যে রুকু সীমা পর্যন্ত ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। এর কম নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু থানবী সাহেব সীমা রেখা ছাড়াই সাধারণ ঝুঁকে যাওয়াকে শিরক পর্য্যায়ভূক্ত করে মুসলমানকে মুশ্‌রিকে পরিণত করে দিয়েছেন। তার উপরোক্ত এবারতের দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। এটা মোটেই ঠিক নয়। কারো সম্মানে যদি মাথা এ পরিমাণ ঝুঁকে যে, তাতে রুকুর সীমা পর্যন্ত পৌছেনা। যেমন, কাউকে সালাম দেয়ার সময় মাথা সামান্য নত হয়ে থাকে, তা হলে তা বৈধ হবে। এই পরিমাণকে না জায়েজ বলা বা তার চেয়ে বেশী ঝুঁকে পড়াকে শিরক ঠাওরানো শুধু গায়ের জোরে অন্যায় হুকুম দেয়ারই শামিল। রুকুর সীমানায় না পৌছানো পর্যন্ত শুধু মাথা নত করা নিষিদ্ধও নয় এবং মকরূহও নয়। হাঁ, রুকুর সীমানায় ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু শিরক নয়। দলীল নিম্নরূপঃ

১নং দলীলঃ

হানাফী মজহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহ্‌তাভী শরীফে উল্লেখ আছেঃ

"اَلتَّحِيَةُ بِالرُّكُوْعِ مَكْرُوْهَةٌ *"

অর্থঃ "রুকুর সুরতে কাউকে সালাম দেওয়া মাকরুহে তাহ্‌রীমী"।

২নং দলীলঃ

তাহ্‌তাভী শরীফে "মুশকিলুল আছার" গ্রন্থের বরাতে লিখা আছেঃ

اَلْقِيَامُ لِغَيْرِهٖ لَيْسَ بِمَكْرُوْهٍ لِعَيْنِهٖ اِنَّمَا الْمَكْرُوْهُ مَحَبَّةُ الْقِيَامِ مِنَ الَّذِيْ يُقَامُ لَهٗ فَاِنْ لَّمْ يُحِبَّ وَقَامُوْا لَهٗ لَايُكْرَهُ لَهُمْ جَمِيْعًا *

অর্থঃ "কারো সম্মানের উদ্দেশ্যে শুধু দাঁড়ানো মাক্‌রূহ নয়। বরং কোন ব্যক্তি নিজের সম্মানে অন্যের দাঁড়ানোকে পছন্দ করা হচ্ছে মাক্‌রূহ। সুতরাং সে যদি নিজে লোকের দাঁড়ানো না চায় বরং লোকেরা স্বেচ্ছায় তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে কারো জন্যই মাকরূহ হবে না"।

৩নং দলীলঃ

হাদীস শরীফে ঐ দাম্ভিক অত্যাচারী ব্যক্তি সম্পর্কে জাহান্নামের ঠিকানা ঘোষণা করা হয়েছে- যে চায় যে, অন্য লোক অচল মূর্তির মত তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু যারা অত্যাচারের ভয়ে এরূপ করতে বাধ্য হয়, তাদের জন্য ঐ শাস্তি নয়। ওহাবীগণ এই হাদীসকে পুঁজি বানিয়ে অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য লোকদের বিরুদ্ধেও শিরকের ফতোয়া দিয়ে ফেলেছে- যা মূর্খতারই নামান্তর।

প্রথমে আমরা হাদীস খানা বর্ণনা করবো। তারপর সাথে সাথে উলামাগণ কর্তৃক উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যাও পেশ করবো-যাতে পাঠকগণ ওহাবীদের প্রতারণা ও অপব্যাখ্যা সম্পর্কে সজাগ হতে পারেন।

(১) তিরমিজি শরীফে উক্ত হাদীস খানা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)*

অর্থঃ নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি চায় যে, লোকেরা তার সম্মানে অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামকে ঠিকানা বানিয়ে নেয়"।- তিরমিজি শরীফ।

উক্ত হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু ঐ অহঙ্কারী অত্যাচারী ব্যক্তির জন্য, যে তার সামনে অন্য মানুষের নত হয়ে অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে। কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তাদের জন্য এই শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা, তারা অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয়েই এরূপ করতে বাধ্য হয়েছে। যদি অত্যাচারের আশংকা না থাক্‌তো, তা হলে তারা কখনও এরূপ করতোনা। কিন্তু ওহাবীরা এসব সূক্ষ্ম চিন্তার ধার ধারেনা। যেখানেই সুযোগ পায়-শিরক এর পাঞ্জা মেরে দেয়। যেমন ওহাবী নেতা ইসমাঈল দেহলভী তার "তাকভিয়াতুল ঈমান" গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় 'শিরক ফিল ইবাদত'- অধ্যায়ে এই হাদীস খানা উদ্ধৃত করে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে বলেছে যে, এরূপ দাঁড়ানো শিরক। ইসমাইল দেহ্‌লভী 'নিজে নিজে দাঁড়ানো' এবং 'দাড়াতে বাধ্য করা'-উভয়কে এক করে ফেলেছে। অথচ হাদীসের মর্ম হলো-দাঁড়াতে বাধ্য করা হলে সে জাহান্নামী হবে। কিন্তু লোকেরা যদি বিনা নির্দেশে কোন অলী, বুজুর্গ, আলেম, ফাজেল বা ন্যায়পরায়ণ শাসকের সম্মানে দাঁড়ায় এবং

উদ্দেশ্য থাকে সম্মান প্রদর্শন করা বা ফয়েজ ও বরকত লাভ করা- তা হলে তা জায়েজ ও উত্তম।

(২) মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেনঃ

هٰذَا الْوَعِيْدُ لِمَنْ سَلَكَ فِيْهِ طَرِيْقَ التَّكَبُّرِ بِقَرِيْنَةِ السُّرُوْرِ لِلْمَثُوْلِ وَاَمَّا اِذَا لَمْ يَطْلُبْ ذٰلِكَ وَقَامُوْا مِنْ تِلْقَاءِ اَنْفُسِهِمْ طَلَبًا لِلثَّوَابِ اَوْ لِاِرَادَةِ التَّوَاضُعِ فَلَابَأْسَ بِهِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ الْخَطَّابِيِّ فِيْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ هُوَ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِذٰلِكَ وَيَلْزِمَهُ اِيَّاهُمْ عَلٰى مَذْهَبِ الْكِبْرِ وَالنَّخْوَةِ *

অর্থঃ "হাদীসে বর্ণিত শাস্তি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে নিজের জন্য অন্যের দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে। কেননা, হাদীসে "অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে"- এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং বিনা নির্দেশে লোকেরা যদি কারো সম্মানে স্বেচ্ছায় দাঁড়ায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে অথবা আদব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে- তাহলে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ মাকরূহ হবে না। ইমাম বায়হাকী তার "শোয়াবুল ঈমান" হাদীস গ্রন্থে খাত্তাবী হতে এ মর্মে হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, অহঙ্কার বশবর্তী হয়ে মানুষকে তার জন্য দাঁড়াতে বাধ্য করা নিষেধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অন্য উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো নিষেধ নয়"। -মিরকাত।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা পরিস্কার ভাবে বলে দিচ্ছে যে, অহঙ্কার বশতঃ অন্য কারো কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কামনা করা দোষনীয় ব্যাপার এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর স্বেচ্ছায় কারো জন্যে তাজিমের উদ্দেশ্যে ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো বৈধ। এই বৈধ কাজকে থানবী সাহেব শিরক বলেছেন। এই ফতোয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে মুশরিকে পরিণত করা হয়েছে। হাদীসের অপব্যাখ্যা করার ফলেই এমনটি হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা দেখলে থানবী সাহেব ঐরূপ ফতোয়া দিতে পারতেন না। আর দেখে থাকলে তা অমান্য করেছেন- বলতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কারো নামে পশু জবাই করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওর ঃ

کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا (شرك وكفر ہے) *

"কারো নামে পশু জবেহ্ করা শিরক" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধন ঃ

প্রকৃত মাসআলা নিম্নরূপ। জবেহ্‌কারীর নিয়ত যদি জবেহ করার সময় এবং ছুরি চালাবার সময় আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো জন্যে হয়, তবে শিরক হবে। কিন্তু জবেহ করার পূর্বে বা পরে কারো নাম নিলে বা উদ্দেশ্যে করলে শিরক হবেনা। সুতরাং জবেহকারী যদি ছুরি চালাবার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবেহ্ করে অথবা আল্লাহর নামের পরিবর্তে অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তাহলে ঐ পশু মৃত বলে গণ্য হবে এবং জবেহ কারী মুশরীক হবে। আর জবেহ করার সময়-বিছমিল্লাহ আল্লাহ আকবার- বলে জবেহ করা হলে তা হালাল হবে- যদিও পূর্বে কারো নামে পশু নির্ধারন করা হোক না কেন। কোন মুসলমান জবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারন করেনা। জবেহ করার পূর্বে বা পরে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির নাম নিয়ে তার রূহে এর সওয়াব পৌছিয়ে দেয়া দোষণীয় নয়। যেমন- কোরবানীর সময় প্রত্যেক মালীকের নাম নেয়া হয় এবং জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়।

১নং দলীল ঃ

ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে ঃ

اِعْلَمْ اَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الذَّبْحِ *

অর্থ ঃ "জেনে রাখা উচিত যে, জবেহ কারার সময়ে যে নিয়ত করা হয়- তাই গ্রহণযোগ্য"

পশুর মালিক এবং জবেহকারী যদি দু'ব্যক্তি হয়, তাহলে জবেহকারীর নিয়তই ধর্তব্য। মালীকের নিয়ত যাই থাকুক না কেন- তা গন্য করা হবেনা। যেমনঃ মালীকের নিয়ত হলো অন্য কারো নামে। কিন্তু জবেহকারী জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করলো, এক্ষেত্রে জবেহকারীর নিয়তই গন্য হবে। এর বিপরীত যদি হয়, যেমনঃ মালিকের নিয়ত হচ্ছে আল্লাহর নামে । কিন্তু জবেহকারী জবেহ করলো অন্যের নাম

নিয়ে। এক্ষেত্রে জবেহকারীর নিয়তই গণ্য করতে হবে। প্রথম সুরতে পশু হালাল, দ্বিতীয় সুরতে পশু হারাম। এ বিষয়টি ফতোয়ায়ে আলমগিরিতে নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ আছে।

২নং দলীল ঃ

জবেহকারীর নিয়তই গ্রহনযোগ্য - এসম্পর্কে আলমগিরীতে উল্লেখ আছে ঃ

"مُسْلِمٌ ذَبَحَ شَاةَ الْمَجُوْسِىِّ لِبَيْتِ نَارِهِمْ اَوِالْكَافِرِ لِاٰلِهَتِهِمْ تُؤْكَلُ لِاَنَّهٗ سَمَّى اللّٰهَ تَعَالٰى *

অর্থ ঃ "কোন মুসলমান যদি অগ্নি পূজকদের উপাসনালয়ের নামে উৎসর্গকৃত ছাগল আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ্ করে অথবা যদি কোন কাফেরের দেবদেবীর নামে উৎসর্গকৃত ছাগল আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করে- তাহলে সে গোস্ত খাওয়া মুসলমানদের জন্যে হালাল হবে। কেননা, জবেহকারী মুসলমান আল্লাহর নামেই জবেহ করেছে। (আলমগীরী)। এখানে জবেহকারীর নিয়তই গণ্য করা হয়েছে। প্রকৃত মালীক অগ্নী উপাসক বা কাফেরের নিয়তের কোন মূল্য দেয়া হয়নি।

৩নং দলীল ঃ

ফতোয়া শামীতে একই হুকুম ভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছে। ঃ

قَوْلُهٗ وَتُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ مِنَ الذَّابِحِ وَاحْتُرِزَ بِهٖ عَمَّا لَوْسَمّٰى لَهٗ غَيْرُهٗ فَلَا تَحِلُّ *

অর্থ ঃ "পশু হালাল হওয়ার জন্যে জবেহকারীর নিজে বিসমিল্লাহ বলা শর্ত। অন্য কেউ বিসমিল্লাহ বললে- আর জবেহকারী না বললে উক্ত গোস্ত খাওয়া হালাল হবেনা। (ফতোয়া শামী)। উক্ত ফতোয়ায় জবেহকারীর নিয়তকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পশুর মালিক বা অন্য কারো নিয়ত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪নং দলীল ঃ

ফতোয়া কাজীখান গ্রন্থে আল্লাহর নামের পরে বরকতের জন্যে রাসুল (দঃ)-এর নাম যোগ করার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

رَجُلٌ ضَحّٰى وَذَبَحَ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ بنام خدا بنام محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ اَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحْمَةُ اللّٰهِ

عَلَيْهِ - اِنْ اَرَادَ الرَّجُلُ بِذِكْرِ اِسْمِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَجْلِيْهِ وَتَعْظِيْمِهٖ جَازَ وَلَابَأْسَ بِهٖ وَاِنْ اَرَادَ بِهِ الشِّرْكَةَ مَعَ اللّٰهِ لَايَحِلُّ ذَبِيْحَتُهٗ *

অর্থ ঃ একজন লোক কোরবানীর পশু জবেহ করা কালীন বললো, 'বিসমিল্লাহ-খোদার নামে, মুহাম্মাদ (দঃ) এর নামে'। এমতাবস্থায় ফতোয়া কি হবে- এ সম্পর্কে শেখ ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ফজল (রহঃ) এর প্রদত্ত ফতোয়া উদ্ধৃত করে কাজীখান বলেনঃ যদি ঐ জবেহকারী হুজুর (দঃ) এর নাম আল্লাহর নামের সাথে তাজীম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে থাকে, তাহলে জায়েজ হবে এবং এতে কোন দোষ হবেনা। আর যদি এভাবে নিয়ত করে "আমি আল্লাহ ও রাসুলের নামে যৌথভাবে জবেহ করছি" তাহলে উক্ত জবেহকৃত পশু হারাম হবে"। -কাজীখান।

এখানে জবেহকারীর নিয়তের ওপর হালাল -হারাম নির্ভরশীল।

৫নং দলীলঃ

জবেহকালীন মুহূর্তে আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নাম মিলানো মাকরূহ- এ সম্পর্কে "কানজুদ্দাকায়েক" নামক ফেকাহ্ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যথাঃ

وَكُرِهَ اَنْ يَذْكُرَ مَعَ اِسْمِ اللّٰهِ غَيْرَهٗ وَاَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ الذَّبْحِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَاِنْ قَالَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَالْاِضْجَاعِ جَازَ *

অর্থঃ " আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নাম উচ্চারন করা এবং জবেহ করার মূহুর্তে বিছমিল্লাহর পরে 'হে আল্লাহ! তুমি অমুকের পক্ষ হতে কবুল কর' একথা বলা মাকরূহ। আর যদি বিছমিল্লাহ বলার পূর্বে এবং শোয়াইবার পূর্বে ঐরূপ বলে- তা হলে বিনা মাকরূহে জায়েজ হবে"।

এই ফতোয়ায় বিছমিল্লাহ বলার পরে এবং জবেহ করার মূহুর্তে অন্যের নাম উচ্চারন করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। কিন্তু শোয়াবার পূর্বে বা বিছমিল্লাহ বলার পূর্বে অন্যের নাম উচ্চারন করলে মাকরূহ হবে না। (কোরবানীর সময় নাম উল্লেখ করা হয় বিছমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলার পূর্বে)।

৬ নং দলীল ঃ

আল্লাহর সাথে অন্যের নাম উচ্চাণ করার ক্ষেত্রে জায়েজ না জায়েজের প্রশ্নে নিম্ন বর্নিত নীতিমালা বর্ননা করে দোররোল মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

وَانْ ذَكَرَ مَعَ اسْمِهِ تَعَالَى غَيْرَهُ فَانْ وَصَلَ بِلَاعَطْفٍ كُرِهَ كَقَوْلِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ اَوْ مِنِّيْ وَمِنْهُ بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَانْ عَطَفَ حُرِّمَتْ نَحْوَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاسْمِ فُلَانٍ" *

অর্থঃ "জবেহকারী যদি আল্লাহর নামের সাথে অন্য কারো নাম উচ্চারন করে তাহলে দু'সুরত হতে পারে। একটি সুরত হলোঃ "وَاوْ" (এবং) শব্দ ব্যতিত অন্যের নাম সংযুক্ত করলে মাকরূহ হবে। যেমন বললো -"আল্লাহর নামে অমুকের পক্ষ হতে বা আমার পক্ষ হতে কবুল করো"। অনুরূপভাবে যদি বলে "বিসমিল্লাহ- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লা"। এক্ষেত্রে মধ্যখানে "وَاوْ" ("এবং") অব্যয় না থাকার কারণেই শুধু মাকরুহ হবে।

দ্বিতীয় সুরত হলো- "وَاوْ" বা ("এবং") অব্যয় সহ উচ্চারন করলে পশুর গোস্ত হারাম হবে। যেমন জবেহকারী বললো- "আল্লাহর নামে এবং অমুকের নামে"। এক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহার করার কারণে দু'জনের নাম সংযুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং গোস্ত হারাম হবে। কিন্তু অব্যয় ব্যবহার না করলে দু'জনের নাম সংযুক্ত হয়না, বিধায় গোস্ত হারাম হবে না, কিন্তু এরূপ বলা শুধু মাক্‌রূহ- শিরক নয়"। মস্‌আলাটি খুবই জটিল। দু নামের মাঝখানে অব্যয় "وَاوْ" থাকলে হারাম হবে এবং না থাকলে শুধু মাকরুহ হবে। এটাই মূলনীতি। কিন্তু কোন মতেই শিরক হবে না।

৭নং দলীলঃ

গায়াতুল বয়ান গ্রন্থের হাওয়ালা উল্লেখ করে ফতোয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে,

وَلَوْقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَحِلُّ وَالْاَوْلَى اَنْ لَّا يَفْعَلَ وَلَوْقَالَ مَعَ الْوَاوِ يَحِلُّ اَكْلُهُ *

অর্থ ঃ জবেহকারী যদি বলে- " বিছমিল্লাহ; সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ" তাহলে দু'নামের মধ্যখানে অব্যয় না থাকার কারণে জবেহ দুরস্ত হবে। তবে এরূপ না করাই উত্তম। আর যদি মধ্যখানে "وَاوْ" অব্যয় ব্যবহার করে, তাহলে গোস্ত খাওয়া জায়েজ হবে। কেননা তখন অর্থ হবে- বিছমিল্লাহ দ্বারা আল্লাহর নাম নেয়া এবং ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ দ্বারা নবীজির উপর পৃথক ভাবে দরূদ পাঠ করা। সুতরাং অব্যয় ব্যবহার করা সত্বেও দু'নামের সংযুক্তি কিছুতেই বুঝাবেনা"। (ফতোয়া শামী),

উপরোক্ত কয়েকটি ফতোয়ার সারমর্ম হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১। জবেহকারী ছুরি চালাবার সময় যে নিয়ত করে, উহাই ধর্তব্য।

২। জবেহ করার পূর্বে অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করার নিয়ত থাকলেও তা দোষণীয় নয়।

৩। জবেহ করা কালীন মূহুর্তে আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নাম যদি তাজীমার্থে উচ্চারন করা হয়, তা হলে দোষণীয় নয়।

৪। জবেহ করার সময়ে জবেহকারী ব্যক্তি যদি আল্লাহর সাথে শরীক করার উদ্দেশ্যে অন্য কারো নাম উচ্চারন করে, তাহলে গোস্ত হারাম হবে। কিন্তু শিরক হবেনা।

থানবী সাহেব এবং অন্যান্য ওহাবী সম্প্রদায় ঢালাও ভাবে জবেহ করার পূর্বে কারো নাম নিলে, কারো সাথে উক্ত পশুকে সম্পর্কীত করলে উহাকে শিরক বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানকে মুশরিকে পরিণত করতে অতি উৎসাহ বোধ করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নিলেই যদি শিরক হতো, তাহলে কোরবানী ও আকিকাতে নাম নেয়ার কারণে পশুর গোস্ত হারাম হতো এবং জবেহকারী মুশরীক হয়ে যেতো। কেননা কোরবানীর পশু ক্রয় করার সময়ই অংশীদারগনের নামে ক্রয় করা হয় এবং জবেহ করার সময়ও তাদের নাম উচ্চারন করতে হয়। সম্ভবত থানবী সাহেবও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

কোন ব্যক্তির সাথে কোরবানীর পশু, নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পর্কীত হওয়া স্বয়ং কোরানে ও হাদীসে উল্লেখ আছে। যেমনঃ "আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার হায়াত, আমার মউত- সবই আল্লাহর রেজামন্দির উদ্দেশ্যে"- আল কোরআন। অনুরূপভাবে হাদীস শরীফেও দাউদী রোজা (একদিন পর একদিন রোজা রাখা) পিতা-মাতার জন্যে নামাজ- ইত্যাদি শব্দ এসেছে। গাইরুল্লাহর দিকে নামাজ, রোজা সম্পর্কীত হলে তাতে সওয়াব হয়। কিন্তু শাহজালালের গরু, মাদার বখ্‌শের মোরগ, সৈয়দ আহমদ কবিরের গরু ইত্যাদি বললে শিরক হবে- এটা কোন্ ধরনের যুক্তি? একজনের রূহে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্য তাঁর নামে পশুর পরিচিতি বা চিহ্নিত করাকে কুফর বা শিরক বলা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়।

৮নং দলীলঃ (ওহাবীদের ভুল ব্যাখ্যা খন্ডন)

ওহাবী সম্প্রদায় কোরআনে মজিদের দুটি আয়াত ও একটি হাদীস শরীফের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করে দাবী করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম এবং এই কাজ শিরক। তাদের পেশকৃত আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে উহার সঠিক ব্যাখ্যা হাওয়ালা সহ নিম্নে বর্ননা করা হলো ।

১। কোরআনের আয়াতঃ . وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ "ঐ সব জীব জন্তু- যা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয় তা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন"। - সুরা বাক্বারা আয়াত নং -১৭৩।

২। অপর আয়াত ঃ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ·

অর্থ ঃ "ঐ সব পশু হারাম- যা প্রতিমা বা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। সুরা মায়েদাহ আয়াত- ৩।

৩। হাদীসঃ * لَعَنَ اللّٰهُ مَن ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ"

অর্থঃ "যে ব্যাক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করে, তার উপর আল্লাহর লানত"। মুসলিম-তিরমিজি।

উপরোক্ত দুটি আয়াত ও একটি হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বাতিল পন্থীরা বলে থাকে যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য পশু জবেহ করা হারাম এবং শিরক। প্রকৃত পক্ষে তাদের এই মন্তব্য বাতিল ও বিভ্রান্তিকর। আয়াতদ্বয় এবং হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা বিভিন্ন তাফছীর ও ফেকাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

পশু জবেহ করার উদ্দেশ্য চার প্রকার যথা ঃ

১। শুধু আল্লাহর রেজামন্দি লাভের উদ্দেশ্যে জবেহ করা। গোস্ত খাওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। যেমনঃ কোরবানী, আক্বিকা ও সদকার মান্নতের পশু জবেহ করা। এগুলো শুধু ইবাদত হিসাবে নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়। এগুলোর গোস্ত খাওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। এগুলোর মধ্যে কোরবানীর জন্যে নির্ধারিত মাস ও দিনে করা শর্ত। অর্থাৎ জিলহজ্জ চাঁদের ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে কোরবানী করতে হবে। হজ্জ উপলক্ষে মীনার নির্ধারিত স্থানে কুরবানী করতে হবে।

২। ছুরি বা অস্ত্রের ধার পরীক্ষার জন্যে জবেহ করা। এটা ইবাদতও নয় এবং গুনাহও নয়।

৩। গোস্ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে জবেহ করা। যেমনঃ বিবাহ শাদীতে ওয়ালিমার জন্যে গরু ছাগল ইত্যাদী জবেহ করা, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কসাইগন কর্তৃক বিক্রির উদ্দেশ্যে গরু ছাগল জবেহ করা, মেহমান অতিথির আগমনে তাদের আপ্যায়নের জন্যে পশু জবেহ করা, সম্মানীত ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে জেয়াফতের উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা, কোন ওলি বুজুর্গের জন্যে ইসালে সওয়াবের নিয়তে ফাতেহা- উরস উপলক্ষে গরু-ছাগল ইত্যাদি জবেহ করা। এসব ক্ষেত্রে গোস্ত খাওয়াই মূখ্য উদ্দেশ্য। সম্মান ও কয়েজ লাভ পরোক্ষ।

উপরোক্ত তিনটি সুরতে বিসমিল্লাহ বলে জবেহ করা হলে পশুটি খাওয়ার জন্যে হালাল হবে।

৪। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে শুধু রক্ত প্রবাহিত করা ও উৎসর্গ করা। গোস্ত খাওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। যেমনঃ দেব-দেবী ও প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু বলি দেয়া। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা। এসব পশু জবেহ করার সময় যদি জবেহকারী শুধু উৎসর্গ করার নিয়তে জবেহ করে তাহলে হারাম হবে— যদিও বিসমিল্লাহ বলা হয়। আর যদি জবেহ কারীর নিয়ত উৎসর্গের না হয়, তা হলে হালাল হবে- যদিও পশুর মালিকের নিয়ত উৎসর্গের জন্যে হোকনা কেন। এই পার্থক্যটি খুবই সুক্ষ্ম। অর্থাৎ বিবেচ্য ও ধর্তব্য বিষয় হচ্ছে জবেহকারীর নিয়ত। তার নিয়তের উপরই হালাল হারাম নির্ভরশীল। ফেকাহ্ সাস্ত্রের এবারত ও বাক্য বিন্যাসের দ্বারা শুধু চতুর্থ প্রকারের জবেহের ক্ষেত্রেই জবেহকারীর নিয়তের উপরই হালাল বা হারামের হুকুম বর্তাবে। জবেহ কারীর নিয়ত যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের রেজামন্দি উদ্দেশ্য হয়, তাহলেই কেবল হারাম হবে। অন্যথায় নয়।

উক্ত মূলনীতি বা সূত্রের ভিত্তি হচ্ছে কোরআন মজিদের উক্ত দুটি আয়াত ও হাদীস শরীফ। যেমনঃ

১। তাফসীরে রুহুল বয়ান ৬ষ্ঠ পারা وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

"مَايُذْبَحُ عِنْدَ اِسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا اِلَيْهِ اَفْتٰى اَهْلُ الْبُخَارٰى بِتَحْرِيْمِهٖ وَقَالَ الرَّافِعِىُّ هٰذَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِاَنَّهُمْ اِنَّمَا يَذْبَحُوْنَهٗ اِسْتِبْشَارًا لِقُدُوْمِهٖ فَهُوَ كَذَبْحِ الْعَقِيْقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُوْدِ مِثْلُ هٰذَا لَايُوْجِبُ التَّحْرِيْمَ كَذَا فِىْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ *

অর্থঃ কোন বাদশাহর আগমন উপলক্ষে অভ্যর্থনার জন্যে তাঁর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে যে পশু জবেহ করা হয়, বোখারার মুফতীগন উক্ত গোস্ত খাওয়াকে হারাম বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন- শুধু নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু ইমাম রাফেয়ী বলেছেন- এটা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য নয়। বরং বাদশাহের শুভাগমনের আনন্দ প্রকাশার্থে ও তাঁর সম্মানে ভোজের উদ্দেশ্যেই জবেহ করা হয়ে থাকে। যেমনঃ নব শিশুর জন্মের আনন্দে আকিকার উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা হয়। এরূপ জবেহ দ্বারা পশু হারাম হতে পারে না। তদ্রূপ- বাদশাহের আগমনের আনন্দে পশু জবেহ করা হলে তা হারাম হবেনা। "শরহে মাশারিক গ্রন্থে'ও এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে।"

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবাদত বা শুধু নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাই হলে- তা হবে হারাম, আর খুশী ও আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে হলে- তা হবে হালাল। নিয়তের তারতম্যের কারনে হুকুমের রদবদল হয়ে থাকে। সুতরাং অন্যের

উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হলেই তাকে ঢালাও ভাবে হারাম বলা যাবে না। উদ্দেশ্যও বিবেচনা করতে হবে।

২। দ্বিতীয় আয়াত وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

অর্থাৎ দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু হারাম" – এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা সোলায়মান জামাল তাফসীরে জামালে বর্ণনা করেন ঃ

اَىْ مَاقُصِدَ بِذَبْحِهٖ النُّصُبُ وَلَمْ يُذْكَرْ اِسْمُهَا عِنْدَ ذَبْحِهٖ بَلْ قُصِدَ تَعْظِيْمًا بِذَبْحِهٖ فَعَلٰى بِمَعْنَي اللاَّمِ فَلَيْسَ هٰذَا مُكَرَّرًا مَعَ مَاسَبَقَ اِذْ ذَاكَ فِيْمَا ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهٖ اِسْمُ الصَّنَمِ وَهٰذَا فِيْمَا قُصِدَ بِذَبْحِهٖ تَعْظِيْمُ الصَّنَمِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهٖ (سُوْرَهْ مَائِدَهْ) *

অর্থঃ "ঐ জানোয়ারকে হারাম করা হয়েছে যাকে জবেহ করার মূহুর্তে দেব-দেবী-ই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং জবেহ করার মূহুর্তে দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ না করে শুধু ঐ গুলোর তাজীম ও সম্মান প্রদর্শন করাই লক্ষ্য ছিল। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথম অংশ

وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ খোদা ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু

এবং দ্বিতীয় অংশ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

অর্থাৎ "দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু" এক নয়। বরং দুটি অংশ দু-অর্থ বহন করে। প্রথম অংশের অর্থ হলো- জবেহ করার সময় দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করা এবং দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো নাম উচ্চারণ না করে বরং সম্মান ও তাজীমের খেয়াল করা।

সুতরাং عَلَى النُّصُبِ শব্দের অর্থ হবে لِلنُّصُبِ-সম্মানার্থে।

খোলাসা ঃ উপরে উল্লেখিত তাফসিরে দুটি জিনিস হারাম করা হয়েছে। আয়াতের প্রথমাংশের وَمَا اُهِلَّ দ্বারা আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া উৎসর্গের উদ্দেশ্যে অন্যের নাম উচ্চারণ করা এবং দ্বিতীয় অংশের وَمَا ذُبِحَ দ্বারা দেবদেবীর তাজীম ও রেজামন্দির উদ্দেশ্যে নিয়ত করা। উভয় প্রকারের জবেহ দ্বারা গোস্ত হারাম হবে। কেননা, উভয় অবস্থায় শুধু রক্ত প্রবাহিত করাই উদ্দেশ্য, গোস্ত খাওয়া উদ্দেশ্য নয়। এই সুরতকেই ফেকাহ সাস্ত্রবিদগন হারাম বলেছেন। উপরে জবেহের প্রকার ভেদের মধ্যে এটি ৪র্থ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পশুর রক্ত

প্রবাহিত করা হারাম, যেখানে গোস্ত আসল উদ্দেশ্য নয়। মোদ্দা কথায় দেবদেবীর নামেও নৈকট্য লাভের উদ্দ্যেশ্যে হলে হারাম হবে। অলীগনের বা মেহমানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

তাফসীরে জামাল উপরের দুটি আয়াতাংশের যে উত্তম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তাতেই পরিস্কার হয়ে গেলো যে, ফাতেহা ও উরসের জন্তু হারাম নয় বরং হালাল – এটা তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এখানে জিয়াফত ও ইসালে সাওয়াবই আসল উদ্দেশ্য । অলীগণের উদ্দেশ্যে জবেহ করা এবং দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা- এক জিনিস নয়।

ওহাবী সম্প্রদায়ের উল্লেখিত হাদীস যথা ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ (مُسْلِمْ وَ تِرْمِذِىْ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ) *

অর্থাৎ " আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু হারাম ও জবেহকারীর উপর আল্লাহর লানত " - দ্বারা তারা সরল প্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে এবং বলে- মেহমান, অতিথি, সম্মানীত ব্যক্তি ও পীর বুজুর্গের জন্যে কোন পশু জবাই করা হারাম।

জবাবঃ

তাদের এই অপব্যাখ্যার জবাব হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীসঃ

مَنْ ذَبَحَ لِضَيْفٍ ذَبِيْحَةً كَانَتْ لَهٗ فِدَاءً مِّنَ النَّارِ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ)

অর্থঃ "মেহমানের জিয়াফতের উদ্দেশ্যে যে ব্যাক্তি পশু পাখী জবেহ করবে রোজ হাশরে ঐ পশু পাখী তার জন্যে দোজখ থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য হয়ে যাবে"। (হযরত জাবের (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ননা করেছেন)

এখন ওহাবীদের প্রতি প্রশ্ন হলোঃ দ্বিতীয় হাদিসটি তোমরা উল্লেখ করোনা কেন? উভয় হাদিসের মধ্যে বাহ্যিক বৈপরিত্ব দেখা গেলেও মূলত কোন দ্বন্ধ নেই। মোহাদ্দেসীনে কেরামগন পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, দুটি হাদীসে জবেহ করার দুটি উদ্দেশ্য বয়ান করা হয়েছে। প্রথম হাদীসে গাইরুল্লাহ বা দেব দেবীর জন্যে উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে মেহমানদের সম্মানে জিয়াফতের কথা বলা হয়েছে। প্রথম হাদীসে গাইরুল্লাহ অর্থ দেবদেবী। অলী আল্লাহগণ গাইরুল্লাহ নন। সুতরাং প্রথমটি হারাম আর দ্বিতীয়টি হালাল ও সুন্নাত। অনুরূপ ভাবে অলী-বুজুর্গের

রূহে ইসালে সাওয়াবের নিয়তে পশু জবাই করাও সুন্নাত। নবী করিম (দঃ) অনাগত সকল উম্মতের জন্যে কোরবানীর পশু জবাই করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হুজুর (দঃ) এর পক্ষ থেকে সকল উম্মতের রূহে ইসালে সাওয়াব করা। সকলের মধ্যে অলীগণও শামিল।

৯ নং দলীলঃ

মেহমানের জিয়াফতের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা সম্পর্কে দোররে মোখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

لَوْ ذَبَحَ لِلضَّيْفِ لَايَحْرُمُ لِاَنَّهٗ سُنَّةُ الْخَلِيْلِ وَاِكْرَامُ الضَّيْفِ اِكْرَامُ اللّٰهِ"*

অর্থঃ "মেহমানের জন্যে জবেহ করা হারাম নয়। বরং তা ইবরাহীম খলিলের (আঃ) সুন্নাত। মেহমানকে সম্মান করা হলে আল্লাহকেই সম্মান করা হয়"। (দোররে মোখতার)।

গেয়ারবী, উরস ও ফাতেহার মধ্যে অলী বুজুর্গদের জন্যে সম্মান সুচক ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হয়ে থাকে। সুতরাং জায়েজ। ওহাবীরা দেবদেবী ও অলীগণকে গাউরুল্লাহ মনে করে অলীদের বেলায়ও উক্ত আয়াত ব্যবহার করে। কাফেরদের শানে নাজিলকৃত আয়াতকে মুসলমানের উপর ব্যবহার করা ওহাবী খারেজীদের কাজ। তাফসীরে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, অলীগণ গাইরুল্লাহ নন বরং অলী আল্লাহ। – অনুবাদক।

১০ নং দলীল ঃ

মেহমান বা অন্য কারো সম্মানে জিয়াফতের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হালাল- এ সম্পের্কে ফতোয়া শামী লিখেনঃ-

"قَالَ الْبَزَّازِيُّ مَنْ ظَنَّ اَنَّهٗ لَايَحِلُّ لِاَنَّهٗ ذُبِحَ لِاِكْرَامِ ابْنِ اٰدَمَ فَيَكُوْنُ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْاٰنَ وَالْحَدِيْثَ وَالْعَقْلَ فَاِنَّهٗ لَارَيْبَ اَنَّ الْقَصَّابَ يَذْبَحُ لِلرِّبْحِ وَلَوْ عَلِمَ اَنَّهٗ يَنْجَسُ لَايَذْبَحُ وَيَلْزَمُ هٰذَا الْجَاهِلَ اَنْ لَّايَاْكُلَ مَاذَبَحَ الْقَصَّابُ وَمَا ذُبِحَ لِلْوَلَائِمِ وَالْاَعْرَاسِ وَالْعَقِيْقَةِ - وَفِى الْخَزَانَةِ قَالَ

الْاِمَامُ اِسْمَاعِيْلُ اِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الْاِبِلَ اَوِالْبَقَرَ لِاَجَلِ الَّذِىْ يَقْدَمُ مِنَ الْحَجِّ وَالْغَزْوِ قَالَ الشَّيْخُ اَبُوْحَفْصٍ وَالْقَاضِىْ الْاِمَامُ عَلِىُّ النَّسَفِىُّ وَغَيْرُهُمْ اَمَّا اَنَا مَاكَرِهُ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ لَااُكَفِّرُهٗ وَلَانُسِىءُ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ اَنْ يَتَقَرَّبَ اِلَى الْاٰدَمِىِّ بِهٰذَ النَّحْرِ *

অর্থঃ "মেহমানের উদ্দেশ্যে জবেহ্‌কৃত পশু সম্পর্কে ইমাম বাজজাজী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, যেহেতু মানুষের সম্মানে জবাই করা হয়েছে, সুতরাং ইহাও আয়াতের মধ্যে শামিল হয়ে হারাম হয়ে যাবে, তার এরূপ মনে করা কোরআন, হাদীস ও যুক্তির পরিপন্থী। কেননা, কসাই পশু জবেহ করে লাভের উদ্দেশ্যে। যদি সে জানতো যে, এ ধরনের জবেহের কারনে পশুটি হারাম হয়ে যাবে, তাহলে সে কখনও জবাই করতো না এবং ওলিমা, উরস ও আকিকার জন্যেও জবাই করা হতোনা । খাজানা নামক গ্রন্থে ইমাম ইসমাইল বলেছেন যে, হাজী অথবা গাজীর প্রত্যাবর্তণ উপলক্ষে গরু ও উট জবাই করা সম্পর্কে শেখ আবু হাফসও ইমাম নসফী প্রমুখ বলেন; যদিও আমি এরূপ পছন্দ করিনা, তবুও জবাইকারী বা আয়োজন কারীকে কাফের বলতে পারিনা। কেননা একজন মুসলমান ব্যক্তি এই জবেহের দ্বারা অন্য মানুষের ইবাদত বা তাকাররুব এর নিয়ত করতে পারে- এরূপ কুধারনা আমরা করতে পারিনা"। –শামী।

এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, উরস, ওলিমা, জিয়াফত ও আকিকার নিয়তে কারো নামে জবাই করা শিরক তো দূরের কথা, নাজায়েজ বা হারামও নয়। অথচ থানবী সাহেব ঢালাও ভাবে কারো নামে জানোয়ার জবাই করাকে শিরক বলে সকল মুসলমানকে মুশরিকে পরিনত করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

চতুর্দশ অধ্যায়

কারো দোহাই দেয়া প্রসঙ্গে ঃ

বেহেস্তি জওরঃ

کسی کی دوہائی دینا (شرک ہے)

"কারো দোহাই দেয়া শিরক"। (প্রথম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ বা ভ্রম সংশোধন ঃ

দোহাই বলা হয় - কারো আশ্রয় চাওয়া, কারো উছিলা দেয়া, বিপদে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা শরীয়তী বিধান মতে জায়েজ। এটা কিছুতেই শিরক হতে পারে না এবং দোহাই প্রার্থী ব্যক্তিও মুশরিক হবেনা। আল্লাহ ছাড়া অন্যের দোহাই দেয়ার প্রমান সাহাবায়ে কেরাম হতেই পাওয়া যায়। দলীলাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১ নং দলীল ঃ

মুসলিম শরীফে হজরত আবু মাসউদী বদরী (রাঃ) হতে বর্নিতঃ

তিনি (বদরী) তাঁর ক্রীতদাসকে শাস্তি প্রদান করছিলেন। ক্রীতদাসটি আউজু বিল্লাহ বলে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছিলেন। কিন্তু হজরত আবু মাসউদী বদরী (রাঃ) তবুও মারপিট বন্ধ করেননি। অতঃপর গোলামটি বলে উঠলোঃ

اَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَرَكَهُ *

অর্থ ঃ গোলামটি তখন বলে উঠলো- আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পানাহ চাচ্ছি- তাঁর দোহাই দিচ্ছি। একথা শুনেই হজরত আবু মাসউদী (রাঃ) তাঁকে ছেড়ে দিলেন"। - মুসলিম শরীফ। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের দোহাই হারাম ও শিরক হলে ক্রীতদাস ঐরূপ বলতেন না।

২নং দলীলঃ

ইমাম বোখারীর দাদা ওস্তাদ আল্লামা আবদুর রাজজাক তাঁর মোসান্নাফ গ্রন্থে হজরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে উপরে ১নং উল্লেখিত মর্মে বর্নিত অন্য এক হাদীসে বলেনঃ "এক ব্যাক্তি আপন গোলামকে মারতেছিলেন। গোলামটি আল্লাহর দোহাই দেয়া সত্ত্বেও মনিব মার বন্ধ করেননি। এমন সময় সে পথ দিয়ে মজলুমের আশ্রয় রহমাতুল্লিল আলামীন হুজুর (দঃ) যাচ্ছিলেন। নবীজিকে দেখে গোলামটি বলে উঠলোঃ

اَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আমি আল্লাহর রাসুলের দোহাই দিচ্ছি- আমি তাঁর পানাহ চাচ্ছি। অতঃপর মনিব ব্যক্তি হাতের অস্ত্র ফেলে দিলেন এবং গোলামকে ছেড়ে দিলেন। আরবী এবারতটি হচ্ছে -

فَالْقٰى مَا كَانَ فِىْ يَدِهٖ وَخَلّٰى عَنْ عَبْدِهٖ *

অর্থঃ "ঐ মনিব রাসুলের দোহাই শুনে হাতের অস্ত্র ফেলে দিল এবং গোলামকে ছেড়ে দিল"।

দেখুন! নবী করিম (দঃ) ঐ গোলামকে নিজের দোহাই দিতে দেখেও নিষেধ করেননি। মনিবকেও তিনি কাফের বলেননি এবং গোলামকেও দোহাই দেয়ার কারণে মুশরিক বলেননি এবং নিজের নামে দোহাই দেয়াকেও শিরক বলেন নি। আল্লাহর দোহাই -এর প্রতি মনিবের ভ্রুক্ষেপ না করা গোলামের মারধর চালু রাখা এবং নবীর দোহাই শুনামাত্র মারধর বন্ধ করে দেয়া -কোনটার প্রতিই নবী করিম তাঁকে তিরস্কার না করার কারণ হচ্ছে- রাসুলের দোহাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই দোহাই বলে বিবেচিত।

৩নং দলীলঃ

জোবাইর ইবনে বাক্কার হজরত হারিছ ইবনে আউফ (রাঃ) থেকে বর্ননা করেছেন। তিনি নবী করিম (দঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

يَامُحَمَّدُ اِنِّىْ عَائِذٌ بِكَ *

"হে প্রিয় মুহাম্মদ রাসুল! আমি আপনার পানাহ্ চাই আপনার দোহাই দেই"।

৪ নং দলীল ঃ

এক মিশরীয় ব্যক্তি হজরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে জুলুমের বিরুদ্ধে এভাবে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেনঃ

يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ عَائِذٌ بِكَ مِنَ الظُّلْمِ *

অর্থঃ "হে আমিরুল মোমেনীন! আমি অত্যাচার হতে আপনার কাছে পানাহ্ চাই"।

এর জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ عُذْتَ مَعَاذًا
অর্থাৎ "তুমি উপযুক্ত স্থানেই পানাহ চেয়েছো"।

৫ নং দলীল ঃ

ইবনে আবদুল হাকীম, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে খোজায়মা প্রমুখ হাদিস বিশারদগন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ননা করেছেন যে, এক বৎসর মদিনা শরীফে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত ওমর (রাঃ) তৎকালীন বসরার শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনে আছ (রাঃ) এর নিকট এ মর্মে ফরমান প্রেরণ করেনঃ

"اَمَّابَعْدُ فَلَعُمْرِىْ يَاعَمْرُوْ مَاتُبَالِىْ اِذَا شَبِعْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ اَنْ اُهْلِكَ اَنَا وَمَنْ مَّعِىْ فَيَاغَوْثَاهُ ثُمَّ يَا غَوْثَاهُ يُرَدُّ قَوْلَهٗ

অর্থঃ সালাম বাদ সমাচার এই- হে আমর! আমার জীবনের শপথ (দোহাই) দিয়ে বলছি- তুমি এবং তোমার এলাকার লোকেরা ধনবান বিত্তশালী হয়ে আরামে দিন যাপন করছো। আর আমি ও আমার এলাকাবাসী না খেয়ে হালাক হয়ে যাচ্ছি- এতে তোমার কোনই পরওয়া নেই। দোহাই দিয়ে বলছি- আমাদের ফরিয়াদ শোন, পুনরায় আমাদের ফরিয়াদ শোন, আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আস"। একথাটা তিনি বার বার উচ্চারণ করেন।

সতর্কবানীঃ থানবী সাহেব ফতোয়ায় বলেছেন যে,"কারো নামের শপথ করলে বা মাথার কসম দিলে শিরক হবে। খোদা ছাড়া অন্য কারো শপথ করা গুনাহ"। কিন্তু হযরত ওমরের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা থানবী সাহেবের ফতোয়া বাতিল প্রমানিত হলো। কেননা, হযরত ওমর فَلَعُمْرِىْ বলে নিজের জীবনের শপথ করেছেন। খোদা ছাড়া অন্য কিছুর শপথ যদি শিরক হয় তাহলে বলতে হয়, (নাউজুবিল্লাহ) নবীজীর দ্বিতীয় খলিফা শিরক করেছেন। (লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম)। এখন থানবী সাহেবই বলুন, হযরত ওমরের(রাঃ) নিজের জীবনের শপথ করার শরিয়তী বিধান কি? হযরত আবু বকর(রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা(রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে পিতার কসম, জীবনের কসম সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐগুলোর হুকুম কি হবে? থানবী সাহেব দয়া করে বলবেন কি?

বস্তুতঃ কোন কথার গুরুত্ব (تَوْثِيْق وَتَاكِيْد) প্রদানের জন্য যে শপথ ও দোহাই দেয়া হয়, তা শরীয়ত মতে জায়েজ। আর বেহুদা কাজে বা কথায় কথায় কারো শপথ করা কিংবা কারো তাজীমার্থে তাঁর নামে শপথ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। নিষেধের কারণও এটিই। ইহার উপরই ফতোয়া। নিয়তের ওপরই ফতোয়া হবে। কথার ওপর জোর দেয়া উদ্দেশ্য হলে অন্যের কসম জায়েজ, আর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হলে নাজায়েজ হবে। গড়ে হারাম বা শিরক হবে না।

১নং প্রমাণঃ

খাজানাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে কারো পায়ের নীচের মাটির শপথ করার শরীয়তি বিধান সম্পর্কে উল্লেখ আছে ঃ

اگر کسے بخاك پائے فلاں سوگند خورد بعضے گفته اند کافر شود واز ابی یوسف رحمة الله علیه آمده که کافر نشود واصح اینست *

অর্থঃ "যদি কেউ কোন ব্যক্তির পায়ের নীচের মাটির শপথ করে, তাহলে কারো কারো মতে ঐ ব্যক্তি কাফের হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) (হানাফী মজহাবের ইমাম আবু হানিফা(রহঃ)-এর প্রধান শাগরিদ) বলেন- ঐ ব্যক্তি কাফের হবেনা। এই মতটিই বিশুদ্ধতম"। (খাজানাতুর রিওয়ায়াত)।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করুন-ইমাম আবু ইউসুফের মতে কারো পায়ের নীচের মাটির শপথ করার মধ্যে প্রকাশ্যে গাইরুল্লাহর সম্মান প্রদর্শন সত্বেও কুফরী হয়না। আর যেখানে অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির নামে শপথ করার মধ্যে শুধু কথার বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতাই উদ্দেশ্য হয়, তা কি করে কুফরী হবে? ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর ফতোয়ার মোকাবেলায় থানবী সাহেবের কি মূল্য?

২নং প্রমাণঃ

দোররুল মোখতার কিতাবে উল্লেখ আছেঃ

هَلْ يُكْرَهُ الْحَلَفُ لِغَيْرِ اللّٰهِ قِيْلَ نَعَمْ وَعَامَّتُهُمْ لَا وَبِهٖ اَفْتَوْا لَاسِيَّمَا فِىْ زَمَانِنَا وَحَمَلُوا النَّهْىَ عَلَى الْحَلَفِ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَا عَلٰى وَجْهِ الْوَثِيْقَةِ كَقَوْلِهِمْ بِاَبِيْكَ وَلَعُمْرِىْ *

অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মাক্‌রূহ হবে কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেছেন-মাক্‌রূহ হবে। কিন্তু অধিকাংশ মুফতী ও ইমামগণই বলেছেন-না, মাক্‌রূহ হবে না। এ কথার উপরই ফতোয়া হয়েছে। বিশেষতঃ আমাদের এই শেষ যুগের পরিবেশের প্রেক্ষাপটে মাক্‌রূহ হবে না। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার যে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা হাদীসে উল্লেখ আছে- তার ক্ষেত্র হলো শুধু বেহুদা কথায় ও কাজে এরূপ শপথ করা। কিন্তু বিশ্বস্ততা প্রমাণের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বা মাক্‌রূহ হবে না। যেমন কেউ বললো- 'তোমার বাপের কসম', বা 'আমার জীবনের কসম' করে বলছি। এখানে পিতা বা নিজের জীবনের তাজীম বা সম্মান উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে- কথার উপর জোর দেওয়া ও বিশ্বাস জন্মানো।

৩নং প্রমাণঃ

গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা সম্পর্কে দোররে মোখতার গ্রন্থে লিখিত আছেঃ

وَهَلْ يُكْرَهُ الْحَلَفُ لِغَيْرِ اللّٰهِ قِيْلَ نَعَمْ وَعَامَّتُهُمْ لَا وَبِهٖ اَفْتَوْا لَا سِيَّمَا فِىْ زَمَانِنَا وَحَمَلُوا النَّهْىَ عَلَى الْحَلَفِ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَا عَلٰى وَجْهِ الْوَثِيْقَةِ كَقَوْلِهِمْ بِاَبِيْكَ وَلَعُمْرِىْ *

অর্থঃ গায়রুল্লাহর নামে শপথ বা কসম করা কি মাকরূহ? এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ এরূপ করা মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফতিগণই বলেছেন যে, মাকরূহ হবে না এবং এটার উপরই ফতোয়া দেয়া হয়। বিশেষ করে আমাদের যুগের পরিবেশের কারণে এরূপ ফতোয়া হবে। গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার মধ্যে যদি কথার গুরুত্ব আরোপ ও বিশ্বাস স্থাপন উদ্দেশ্য না হয় বরং এমনিতেই অভ্যাস বশতঃ পিতার বা নিজের জীবনের শপথ করে-তাহলে এক্ষেত্রেই কেবল নিষিদ্ধ হবে। (পুনরাবৃত্তি)

আল্লামা হাশমত আলী রেজভী(রহঃ) বলেনঃ শপথ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং বিশ্বস স্থাপন করানো। সুতরাং পিতা-মাতা, নিজের, এমনকি যে কোন বস্তুর শপথ করাই জায়েজ। সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবেরে দ্বীন ব্যক্তিবর্গ হতে এমন শপথের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা আল্লাহর কাছে ধর্মের মধ্যে নিকৃষ্ট বিদআত সৃষ্টিকারীদের থেকে পানাহ্ চাই। ভুল ব্যাখ্যাকারীর ধোকা থেকেও খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কোন স্থানের তাজিম করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওরঃ

"کسی جگہ کا کعبہ کی برابر ادب وتعظیم کرنا شرک ہے

-"অন্য কোন স্থানকে কা'বার সমান সম্মান ও তাজীম করা শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ্ বা ভুল সংশোধনঃ

থানবী সাহেব "অন্য কোন স্থান"-এর এত সংক্ষেপ বর্ণনা দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? খোলাখুলিভাবেই তিনি বলতে পারতেন যে, মদিনা শরীফ এবং অলী আউলিয়াগণের মাজারসমূহের সম্মান করা শিরক। যেমন তার অগ্রগামী ওহাবী নেতা ইসমাইল দেহলভী তাকভীয়াতুল ঈমান নামক গ্রন্থে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে "কা'বা শরীফের আশপাশের সম্মান করা অর্থাৎ তথায় শিকার না করা ও গাছ কর্তন না করা-এসব কাজ আল্লাহ্ তায়ালা আপন ইবাদতের উদ্দেশ্যেই নিষেধ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি কোন পয়গম্বর বা মূর্তির আশপাশের স্থানসমূহের বা জঙ্গলসমূহের আদব ও তাজীম করে তাহলে শিরক হবে। চাই সে পয়গম্বর বা মূর্তি নিজে নিজে এই তাজীমের লায়েক হউক অথবা তাদের তাজীমের দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা খুশী হবেন বলে মনে করা হোক-সর্বাবস্থায়ই শিরক্ হবে"। -(তাকভীয়াতুল ঈমান)।

থানবী সাহেব যেহেতু ইসমাইল দেহ্লভীর অনুসারী, সেহেতু নেতার কথার সাথে সামান্য পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। কাজেই নেতা যে কথা বিস্তারিত বলেছেন-সে কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৌশলে একটু সংক্ষিপ্ত করে বলা উচিত। তাই তিনি সংক্ষেপে ও কৌশলপূর্ণ ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "অন্য কোন স্থানকে কাবার মত তাজীম করা শিরক"। উভয়ের কথার মধ্যে শব্দের পরিবর্তন হলেও অর্থের মধ্যে কোনই পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ মদিনা মোনাওয়ারার রওজা মোবারক এবং অলী-আল্লাহগণের মাজারের সম্মান করা শিরক, আশপাশের তাজীম করা শিরক। থানবী সাহেবের উল্লেখিত "অন্য কোন স্থান" বলতে মদিনা তাইয়েবা ও অলী আউলিয়াগণের মাজার এবং বায়তুল মোকাদ্দাসসহ সব জায়গাকে-ই বুঝান হয়েছে। অন্য সব জায়গাই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার কথা অনুযায়ী কেউ যদি সম্মান করে মদিনা শরীফের গাছ গাছড়া না কাটে এবং কোন পশু শিকার না করে, তাহলে সে শিরক করলো। কেননা, এতে মক্কা শরীফের সমান মর্যাদা দেয়া হলো। কিন্তু চোখের পর্দা খুলে দেখলে এবং কানের আটি খুলে তা শুনলে দেখা যাবে যে, অসংখ্য সহিহ্ হাদীসে মদিনা মোনাওয়ারাকেও হেরেম

শরীফ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্যই মককা ও মদিনা শরীফকে "হারামাইন শরীফাইন" বলা হয়। মককা শরীফের মতই মদিনা শরীফের রওজা মোবারকের আশপাশের গাছ-গাছালী কাটা ও জন্তু শিকার করা নিষিদ্ধ। ঐ স্থানের তাজীম ও সম্মান করার জন্য হাদীসে আদেশ করা হয়েছে। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাবত্রয় এই নীতিই গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ ইমাম, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইহাই মতামত। অবশ্য হানাফী মাযহাবে অন্য হাদীসের উপর আমল করে গাছ-গাছালী কাটা ও পশু শিকার করার ক্ষেত্রে নমনীয় ভূমিকা পালন করা হয়েছে। কিন্তু সম্মানের ক্ষেত্রে মককা মোয়াজজমার মতই বরং তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইমাম তাহাভীর "শরহে মাআনিউল আছার" হাদীস গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ ও কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। মোদ্দাকথা- মককা শরীফের মতই নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফকেও হেরেম ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কীত হাদীস সমূহ "মোতাওয়াতের" হাদীসের মর্যাদা লাভ করেছে। নিম্নে "হেরেমে মদিনা" সম্পর্কীত হাদীস সমূহ ও দলীলসমূহ বর্ণনা করা হলো- যাতে ঈমানদারের ঈমান তাজা হয় এবং ওহাবীদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন হয়।

১নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ اُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ اَنْ يُّقْطَعَ عَضَاهُهَا اَوْيُقْتَلَ صَيْدُهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهٗ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا " *

"হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম মককা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছেন এবং আমি (মুহাম্মদ দঃ) মদিনার পাথর ঘেরা স্থানের মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেম ঘোষণা করছি। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় তিনি বলেছেন- এর আশপাশের বাবুল বৃক্ষ কর্তন করা বা পশু শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি"। মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় এসেছে-"মদিনার কোন পশু শিকার করা যাবেনা"।-বুখারী ও মুসলিম। ইহা শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মযহাবের দলীল।

২নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَفِيْ اُخْرٰى اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا " *

হযরত ইবরাহীম(আঃ) যেভাবে মককা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছেন, অনুরূপভাবে আমিও মদিনা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করলাম। অন্য বর্ণনায় "পাথর ঘেরা স্থানের মধ্যবর্তী স্থান" শব্দ এসেছে।

৩নং দলীলঃ

মুসলিম শরীফে নবী করিম(দঃ) হেরেমে মদিনার সম্মান সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَابَيْنَ مَازَمَيْهَا اَنْ لَّا يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرٌ اِلَّا الْعَلَفُ" *

"হে আল্লাহ! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম মককাকে হেরেম শরীফ ঘোষণা করেছেন। আমি মদিনা শরীফের উভয় দিকের মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেম শরীফ বলে ঘোষণা করলাম। এই হেরেমেও রক্তপাত করা যাবেনা, মারার জন্য অস্ত্রধারণ করা যাবেনা এবং গাছের পাতাও ছেড়া যাবেনা; তবে ঘাস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে"।

৪নং দলীলঃ

আবু দাউদ শরীফে হযরত ছাআদ ইবনে ওয়াক্কাছ(রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هٰذَ الْحَرَمَ *

"নবী করিম(দঃ) এই মদিনা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছেন"।

৫নং দলীলঃ

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস(রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

"اَحَرَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَايُخْتَلٰى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

হযরত আনাছ(রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নবী করিম(দঃ) কি মদিনা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছিলেন? অন্য রেওয়ায়াতে হযরত আনাছ (রাঃ) জবাবে বলেছিলেন- হাঁ! মদিনা শরীফ হেরেম। এর কোন বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না এবং এর ঘাসও উৎপাটন করা যাবে না। যে একাজ করবে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিস্তা ও মানব জাতির অভিশাপ (লানত) বর্ষিত হবে"।

৬নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা(রাঃ) বর্ণিত হাদীসঃ

حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا وَجَعَلَ اِثْنَىْ عَشَرَ مِيْلًا وَفِىْ رِوَايَةِ جَرِيْرٍ شَجَرُهَا اَنْ يُعْضَدَ اَوْ يُخْبَطَ *

"নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফের পাথরী এলাকার মধ্যে বার মাইল এলাকা হেরেম ঘোষণা করেছেন"। জারীরের বর্ণনায় এরশাদ করেছেনঃ "উক্ত হেরেমের মধ্যে গাছ কাটা যাবে না এবং গাছের পাতাও ছিঁড়া যাবে না"।

৭নং দলীলঃ

ইমাম ছাখাভী(রহঃ)হযরত আবু হোরায়রা(রাঃ) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا اَوْ يُخْبَطَ اَوْ يُؤْخَذَ طَيْرُهَا *

"নবী করিম(দঃ) হেরেমে মদিনার গাছ কর্তন, গাছের পাতা ছিঁড়া অথবা পশু-পাখী শিকার করতে নিষেধ করেছেন"।

৮নং দলীলঃ

ইমাম আবু জাফর সুরাহবিল(রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

"তিনি বলেন, আমরা শিকারের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফের হেরেম সীমানার মধ্যে ফাঁদ পেতেছিলাম। সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত(রাঃ) ফাঁদ দেখে বললেনঃ

الم تعلم ان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ صَيْدَهَا وَفِىْ رِوَايَةِ اِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا *

"তোমরা কি জাননা যে, নবী করিম(দঃ) হেরেমে মদিনার মধ্যে শিকার করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আবি শায়বার বর্ণনা মতে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) এও বলেছিলেন যে, "নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফের পাথুরী এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে শিকার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন"।

৯নং দলীলঃ

ইমাম তাহ্‌তাভী(রহঃ) হযরত ইবরাহীম ইবনে আউফ(রাঃ) থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম(রাঃ) বলেনঃ আমি একটি চড়ুই পাখী ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পিতা আউফ(রাঃ) আমাকে এ অবস্থায় দেখে আমার কান মলে দিয়ে চড়ুই পাখীটি ছেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ

حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا *

"নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফের পাথুরী এলাকার মধ্যবর্তী স্থানের শিকার হারাম করে দিয়েছেন এবং উক্ত এলাকাকে হেরেম ঘোষণা করেছেন"।

সুধী পাঠক! উপরোক্ত ৯টি হাদীসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণীত হলো। যথাঃ

(ক) নবী করীম (দঃ) মককা শরীফের ন্যায় মদিনা শরীফকেও হেরেম ঘোষণা করেছেন।

(খ) মককা শরীফের আশপাশের এলাকার যেভাবে সম্মান করতে হবে, তদ্রূপ সম্মানই করতে হবে মদিনা শরীফের চারপাশের এলাকাকে।

(গ) মককা শরীফে হত্যা করা, রক্তপাত করা, শিকার করা, শিকারকে দৌড়ানো, পাখ-পাখালী ধরা, গাছ-গাছালীর পাতা ছিঁড়া ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ; তেমনিভাবে মদিনা শরীফেও ঐ কাজ নিষিদ্ধ। (হানাফী মযহাব মতে হারাম নয়)।

(ঘ) উভয় হেরেমেই ঐ নিষিদ্ধ কাজ আল্লাহ্, ফিরিস্তা ও মানবজাতির লানতের কারণ।

(ঙ) সাহাবায়ে কেরাম মককা শরীফের ন্যায় মদিনা শরীফেরও সমান সম্মান প্রদর্শন করতেন। সর্বোপরি নবী করিম(দঃ) উভয় হেরেমের সমান আদব ও তাজীমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখন বিচার্য্য বিষয় হলো– নবী করিম(দঃ) কা'বা শরীফের ন্যায় মদিনা শরীফের সম্মান ঘোষণা করে কি শিরকের কাজ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম মদিনা শরীফের তাজীম করে কি শিরকের কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন? কখনই নয়। কিন্তু আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তো বেহেস্তী জেওরে বলেছেন–"মককা শরীফের ন্যায় অন্য স্থানের তাজীম করা শিরক"। তার এই ফতোয়ায় আল্লাহর প্রিয় হাবীব(দঃ) এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীগণও শিরক থেকে রেহাই পাচ্ছেন না (নাউজুবিল্লাহ) নবীজীর দুশমন ও পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ কি বলতে পারে? আসলে এই সম্প্রদায়টি তাদের নজদের প্রিয় লাইলী ইবনে ওহাব নজদীর প্রেমে মশ্‌গুল হয়েই তার অনুকরণে এসব প্রলাপ উক্তি করছে। আল্লাহ সত্য উপলব্ধির তৌফিক দিন।

ষোড়শ অধ্যায়

আবদুন্নবী, নবী বখ্‌শ, আলী বখ্‌শ নাম প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওরঃ

علی بخش - حسین بخش -

عبد النبی وغیرہ نام رکھنا (شرك وکفر ہے) *

-"আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী- ইত্যাদি নাম রাখা শিরক ও কুফর"।(১ম খন্ড-৪০ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা ভুল সংশোধনঃ

আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য নাম, যেমন-মুহাম্মদ বখ্‌শ, আহমদ বখ্‌শ, নবী বখ্‌শ, রাসুল বখ্‌শ, আতা মুহাম্মদ, আতা আলী, গোলাম নবী, গোলাম রাসুল, গোলাম জিলানী, গোলাম সাবের- ইত্যাদি নাম রাখা নিঃসন্দেহে জায়েজ। এগুলোকে শিরক ও কুফর বলা শুধু মিথ্যাই নয়, বরং শরীয়তের উপর মিথ্যা অপবাদও বটে। এসব নামকে শিরক বলে শুধু আল্লাহর বান্দাদেরকেই মুশরিক বানানো হয়নি; বরং আল্লাহকেও মুশরিক বানানো হয়েছে। কেননা, আব্‌দ বা বান্দা শব্দটির সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজের সাথে যেমন ব্যবহার করেছেন, অনুরূপভাবে অন্যের সাথেও ব্যবহার করেছেন। নিম্নে কোরআন ও হাদীস থেকে কয়েকটি প্রমাণ পেশ করা হলোঃ

১নং দলীলঃ

মানুষের দাস-দাসীর বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেনঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ *

"তোমাদের বিধবা নারী এবং তোমাদের উপযুক্ত আব্‌দ বা বান্দা-বান্দীদের বিবাহের ব্যবস্থা করো"। সুরা নূর আয়াত নং ৩২।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ক্রীতদাস-দাসীকে "তোমাদের বান্দা-বান্দী" বলেছেন। অথচ এরা আল্লাহরও বান্দা এবং বান্দী। সুতরাং "আবদুন্" শব্দটির প্রয়োগ যেমন আল্লাহর সাথে হতে পারে, তেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথেও হতে পারে। কাজেই "আবদুল্লাহ" বলা যেমন জায়েজ; তদ্রূপ "আবদুন্নবী" বলাও জায়েজ। অনুরূপভাবে আব্‌দে ওমর, আব্‌দে যায়েদ, আব্‌দে বকর ইত্যাদি বলাও জায়েজ।

২নং দলীলঃ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে নবীজীর বান্দা বলেছেনঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ *

হে প্রিয় নবী! আপনি এভাবে ঘোষণা দিন-"হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো অর্থাৎ গুনাহ করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়োনা"। সূরা যুমার ২৪ পারা আয়াত নং ৫৩। -(বয়ানুল কুরআন)

উক্ত আয়াতে يَا عِبَادِيَ আহবানটি রাসুলুল্লাহর। আহ্‌বানকারী হচ্ছেন স্বয়ং নবী করিম(দঃ)। উক্ত সম্বোধনের নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা قُلْ শব্দ দ্বারা। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ইহাকে (ইয়া ইবাদী) مَقُوْلَہ বলা হয়। عِبَادِىَ শব্দটির মধ্যে ىَ হরফটিকে يَائے نِسْبَتِى বলা হয়-যার সম্পর্ক রাসুলের সাথে। عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ এর বহুবচন। عَبْدٌ অর্থ বান্দা, গোলাম, অনুগামী, অনুসারী, অনুগত ইত্যাদি। এই আয়াতে বান্দা অর্থে রাসুলের অনুগত উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আমরা সকল মোমেনগণ রাসুলের অনুগত বান্দা। অতএব আবদুন্নবী বা আবদুর রাসুল বলা বা নাম রাখা সম্পূর্ণ বৈধ। ইহা কোরআনেরই ভাষ্য। মাওলানা থানবীর পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মককী সাহেব স্বীয় কিতাব "শামায়েমে এমদাদিয়া" ১৩৫ পৃষ্ঠায় বলেনঃ

"عِبَادُ اللّٰهِ کو عِبَادُ الرَّسُوْل کہ سکتے ہیں"

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদেরকে রাসুলের বান্দাও বলা যায়, কেননা কোরআনে এসেছে

قُلْ يَا عِبَادِىَ

মসনবী শরীফকে ফারছী কুরআনও বলা হয়ে থাকে। কেননা কুরআনের সারমর্ম উক্ত মসনবীর মাধ্যমে বয়ান করা হয়েছে। সুরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতের সারমর্ম তিনি (রুমী) তাঁর কাব্যে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেনঃ

بندهٔ خود خواند احمد در رشاد

جمله عالم را بخوان قل يا عباد -*

অর্থঃ নবী আহমদ মোজতবা(দঃ) সমগ্র বিশ্বকে নিজের বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ- তুমি কুরআন মজিদের "কুল ইয়া ইবাদী" আয়াতটি পাঠ করে দেখো"। (মসনবী শরীফ)।

৩নং দলীলঃ

"আবদুন্নবী"সম্পর্কে স্বয়ং ওমর(রাঃ)-এর উক্তি ফতুহুশশাম, আমালী, তারিখে ইবনে আসাকীর, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর ইজালাতুল খাফা ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত ছায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

"হযরত ছায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) বলেন-আমিরুল মোমেনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর খেলাফতের শুরুতে সাহাবায়ে কেরামের মজলিশে এক ভাষণে বলেছিলেন যে, "আমি জানতে পেরেছি যে, কোন কোন লোক আমার কঠোরতাকে ভয় পাচ্ছে এবং পরস্পর বলাবলি করছে-ওমর রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্তমানে এবং আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে- যখন তিনি শাসক ছিলেন না, তখনও কঠোরতা করতেন। আর এখনতো তিনি শাসক। না জানি কি করেন। তোমরা ঠিকই বলেছো। তবে আমি তো ছিলাম রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বান্দা এবং খাদেম।

"كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهٗ وَخَادِمَهٗ *

"আমি রাসুলুল্লাহ(দঃ)-এর সাথেই ছিলাম। তবে আমি ছিলাম তাঁর আব্‌দ, বান্দা এবং খাদেম"। এর বেশী কিছু নই।

উক্ত স্বীকৃতিমূলক বর্ণনায় عَبْدُهٗ হুজুরের বান্দা শব্দটিই আলোচ্য বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য। এখানে হযরত ওমর নিজেকে আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল ও আবদুল মোস্তফা ইত্যাদি বলে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং যে কেউ আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল নাম রাখতে পারে।

৪নং দলীলঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক(রাঃ) চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে হযরত বেলাল(রাঃ)কে তাঁর মনিব উমাইয়া ইবনে খলফ থেকে খরিদ করে উভয়ে রাসুলে পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী হযরত বেলালকে মুক্ত দেখে কেঁদে ফেললেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক নিজেকে এবং বেলালকে কি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন- মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী(রহঃ) মসনবী শরীফে কাব্যের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবেঃ

"گفت ما او بندگان کوئے تو-

کردمش آزاد ہم بر روئے تو*

"ইয়া রাসুলাল্লাহ(দঃ)! আমি ও বেলাল উভয়েই আপনার দরবারের দু'জন বান্দা। আমি বেলালকে আপনার খেদমতের জন্য ও আপনার রেজামন্দির জন্য আযাদ করে দিলাম"। এখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজেকে এবং হযরত বেলাল (রাঃ)কে হুজুরের বান্দা বলে স্বীকার করেছেন। অথচ থানবী সাহেব এটাকেই শিরক বলছেন। (নাউজুবিল্লাহ)।

৫নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম সহ অপর চারটি হাদীস গ্রন্থে নবী করিম(দঃ) ক্রীতদাসকে মালিকের "আব্‌দুহু" বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবেঃ

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَافَرَسِهٖ صَدَقَةٌ - رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالْاَرْبَعَةُ -

"নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেন-কোন মুসলমানের উপর তার আব্‌দ বা গোলাম এবং আরোহণের কাজে ব্যবহৃত ঘোড়ার জাকাত নেই"। (বুখারী, মুসলিম ও অন্য ৪ কিতাব)।

উক্ত হাদীসে আব্‌দ বা গোলামের সম্পর্ক মালিকের সাথে করে নবীজী আব্‌দে ওমর, আব্‌দে বকর ইত্যাদি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং "আবদুন" শব্দের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে যেমন জায়েজ, তেমনিভাবে অন্যের সাথেও জায়েজ।

৬নং দলীলঃ

আরবীতে আব্‌দুন (عَبْدٌ) শব্দটি গোলাম, ক্রীতদাস, সেবক, খাদেম, অনুগত-ইত্যাদি অর্থে বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে। বেচা-কেনার ক্ষেত্রে আবদুন (عَبْدٌ) শব্দটি তিন অর্থে ফেকাহর কিতাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গোলাম তিন প্রকারের। যথাঃ

(ক) عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ স্থায়ী ক্রীতদাস (খ) عَبْدٌ مُكَاتَبٌ বা চুক্তিবদ্ধ অস্থায়ী গোলাম (গ) عَبْدٌ مُدَبَّرٌ বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মুক্তির চুক্তিবদ্ধ গোলাম। হেদায়া গ্রন্থে এই তিন প্রকারের গোলাম বা "আবদুন" বেচা কেনার একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে। সেখানে مَنْ بَاعَ عَبْدَهٗ অথবা كَاتَبَ عَبْدَهٗ অথবা دَبَّرَ عَبْدَهٗ শব্দগুলো দ্বারা অমুকের আব্‌দ বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়াও যে অন্যের আব্‌দ হতে পারে- তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে সাহাবা, তাবেয়ী ও মোজতাহীদগণের ব্যবহৃত শব্দ মালার মধ্যে। সুতরাং আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল নাম রাখা বা বলা অতি উত্তমভাবেই প্রমাণিত হলো।

ওহাবীদের সন্দেহ খন্ডনঃ

ওহাবী সম্প্রদায় উপরের আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল, আব্‌দে বকর, আব্‌দে ওমর ইত্যাদি নামের স্বপক্ষের কোন দলীল উল্লেখ না করেই কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে তার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐ নামগুলো না জায়েজ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। তাদের ঐ সব অপব্যাখ্যার সঠিক জবাব নিম্নে পেশ করা হলো।

১ম সন্দেহঃ

সুন্নীদের মতে, আবদুন (عَبْدٌ) অর্থ আবেদ বা ইবাদতকারী। সুতরাং আবদুন্নবী নামের অর্থ হবে নবীর ইবাদতকারী। এটা স্পষ্ট শিরক।

জবাবঃ

عَبْدٌ (আবদুন) অর্থ যেমন আবেদ বা ইবাদতকারী হয়, তেমনিভাবে গোলাম বা খাদেম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যখন আল্লাহর নামের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন অর্থ হবে ইবাদতকারী। যেমন আবদুর রহমান। আর যখন গাইরুল্লাহ বা মানুষের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন অর্থ হবে খাদেম বা গোলাম। যেমন আবদুন্ নবী বা আবদুর রাসুল। হযরত ওমর (রাঃ) শেষোক্ত অর্থেই নিজেকে عَبْدٌ বা নবীর গোলাম বলে পরিচয় দিয়েছেন– যা ৩নং দলীলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি আল্লাহর কোন কোন সিফাতী নামে নাম রাখাও জায়েজ। যেমন আলমগীরী কিতাবে উল্লেখ আছেঃ

وَالتَّسْمِيَةُ بِاسْمٍ يُوْجَدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى جَائِزَةٌ كَالْعَلِيِّ وَالرَّشِيْدِ وَالْبَدِيْعِ لِاَنَّهٗ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْمُشْتَرِكَةِ وَيُرَادُ فِىْ حَقِّ الْعِبَادِ مَالَا يُرَادُ فِىْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذَا فِى السِّرَاجِيَّةِ۔

(عَالَمْگِيْرِيْ كِتَابُ الْكَرَاهِيَّةِ بَابُ تَسْمِيَةِ الْاَوْلَادِ) *

অর্থঃ "যেসব সিফাতি নাম কোরআন মজিদে পাওয়া যায়, ঐসব নাম সরাসরি রাখা জায়েজ। যেমন আলী, রশিদ, বদি, ইত্যাদি। কেননা এসব নাম দ্বিত্ব অর্থবোধক। আল্লাহর ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হবে–সে অর্থে বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবেনা। নাম একই থাকবে, কিন্তু অর্থের মধ্যে পার্থক্য হবে। ছেরাজিয়া গ্রন্থে এরূপই মত প্রকাশ করেছেন ইমামগণ"। (আলমগিরী কিতাবুল কারাহিয়াত বাবু তাছমিয়াতুল আওলাদ)।

আলমগিরীর উপরোক্ত ফতোয়ার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আলী, রশিদ, বদি, ইত্যাদি যেমন আল্লাহর নাম, তেমনিভাবে বান্দার নামও হতে পারে। তবে আল্লাহর ক্ষেত্রে অর্থ হবে এক রকম এবং বান্দার বেলায় অর্থ হবে অন্যরকম। অনুরূপভাবে "আবদুল্লাহ" (عَبْدُ اللّٰه) অর্থ আল্লাহর ইবাদতকারী, আর "আবদুন্নবী" (عَبْدُ النَّبِىْ) অর্থ হবে নবীজীর খাদেম ও গোলাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে مِنْ عِبَادِكُمْ (মিন ইবাদিকুম) শব্দটি "তোমাদের গোলাম" অর্থে ব্যবহার করেছেন। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ তো স্বয়ং আল্লাহরই ফয়সালা। এর উপর কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় সন্দেহঃ

ওহাবী সম্প্রদায় দ্বিতীয় সন্দেহ সৃষ্টি করেছে একটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে। হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ وَجَارِيَتِىْ (مِشْكٰوة-بَابُ الْاَدَبِ الْاَسَامِىْ، وَ مُسْلِمْ- كِتَابُ الْاَلْفَاظِ مِنَ الْاَدَبِ)

অর্থঃ নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ যেন নিজের দাস-দাসীকে "আব্‌দী ও আমাতী"– "আমার আব্‌দ ও আমার আমাত" বলে সম্বোধন না করে। তোমরা প্রত্যেক পুরুষই আল্লাহর আব্‌দ এবং প্রত্যেক নারীই আল্লাহর আমাত। বরঞ্চ এভাবে বলবে–"আমার গোলাম বা আমার জারিয়া"। (মিশকাত- বাবুল আদব আল-আছমা এবং মুসলিম- কিতাবুল আলফাজ মিনাল আদব)।

ওহাবীগণ উপরোক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে এভাবে عَبْدٌ "আবদুন" শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের সাথে ব্যবহার করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সেহেতু "আবদুন্ নবী" নাম রাখাও হারাম এবং নিষিদ্ধ।

জবাবঃ

মিশকাত ও মুসলিম শরীফে "নামের আদব" অধ্যায়ে বা শিরোনামে হাদীস খানা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐভাবে নাম রাখা আদবের খেলাফ। কিন্তু নিষেধ নয়। নবী করিম (দঃ) শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রেখেই "আবদী ও আমাতী" বলে সম্বোধন করতে বারণ করেছেন। এই বারণ "শিষ্টাচারমূলক"। ৩নং দলীলে হযরত ওমর (রাঃ) নিজেকে নবীর আব্‌দ বলে পরিচয় দিয়েছেন। যদি নিষেধ হতো তাহলে হযরত ওমর (রাঃ) ঐরূপ বলতেন না। মোদ্দা কথা–"আবদী ও আমাতী" বলে সম্বোধন করা মাকরূহ্ তান্‌জিহী হবে– কিন্তু হারাম হবে না। আল্লামা নবভী (মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

"فَاِنْ قِيْلَ قَدْ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ "اَنْ تَلِدَالْاَمَةُ رَبَّتَهَا" فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْحَدِيْثَ الثَّانِىَ (اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا) لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاَنَّ النَّهْىَ فِى الْاَوَّلِ (لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَاَمَتِىْ) لِلْاَدَبِ وَكَرَاهَةُ التَّنْزِيْهِ لَالِلتَّحْرِيْمِ –*

অর্থঃ "যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়ে তো অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, আন্ তালিদাল আমাতু রাব্বাতাহা?-"যখন আমাত বা বাঁদী প্রসব করবে তার মনিবকে" তখন কেয়ামত হবে। এই দ্বিতীয় হাদীসে "আমাত" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অথচ আলোচ্য প্রথম হাদীসে "আমাতী" শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর সমাধান কি? এর সমাধান হচ্ছে-দ্বিতীয় হাদীসে "আমাতী"বলা জায়েজ হওয়ার প্রমাণবহ এবং প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে- "আমাতী" না বলাই উত্তম। বললে মকরূহ তানজিহী হবে-কিন্তু হারাম হবে না।

আল্লামা নবভীর ব্যাখ্যার পর ওহাবী সম্প্রদায়ের মনগড়া অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। তারা হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন ইমাম বা মুজতাহিদের উদ্ধৃতি দেয় না। ফলে জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এটাই তাদের সুক্ষ্ম কৌশল। আল্লামা শামীর এক ওস্তাদের নাম ছিল আবদুন্নবী। তিনি মুজতাহিদ শ্রেণীভূক্ত ইমাম ছিলেন। যদি এই নাম শিরক হতো-তাহলে তিনি নিজেই নিজের নাম পরিবর্তন করতেন। আল্লামা শামী তাঁর ওস্তাদের নাম এভাবে বলেছেনঃ

فَاِنِّى اَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِنَا-اَلشَّيْخُ عَبْدُ النَّبِىُّ اَلْخَلِيْلِىُّ *

"আমি আমার ওস্তাদ আবদুন্নবী খলিলীর নিকট থেকে এলেম শিক্ষা করেছি ও সনদ নিয়েছি"। দেখা যাচ্ছে- আল্লামা শামীও এই নাম সমর্থন করেছেন।

৭নং দলীলঃ

আলী বখ্‌শ, নবী বখশ- ইত্যাদি নাম রাখা শিরক তো দূরের কথা-এমনকি মাকরূহও নয়। কোরআন মজিদে হযরত ইছা আলাইহিস সাল্লামকে 'জিব্রাইল বখ্‌শ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا *

অর্থঃ "হে মরিয়ম। আমি (জিব্রাইল আঃ) তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান বখ্‌শিষ করতে খোদার পক্ষ হতে এসেছি"। সুরা মরিয়ম আয়াত নং ১৯।

উক্ত আয়াতে হযরত ইছা (আঃ)কে জিব্রাইলের দান বলে উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, কারও অলৌকিক কারামতে বা দোয়ার বরকতে সন্তান হলে অমুকের দান বা বখশিষ বলা জায়েজ আছে। আরবীতে এধরনের কথাগুলোকে মাজাজে আক্‌লী مَجَازْ عَقْلِى বলা হয় এবং এটা বৈধ। এটা অছিলার বা কার্য্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত। নবী বখ্‌শ, রাসুল বখ্‌শ- অর্থ রাসুলের উছিলায় প্রাপ্ত সন্তান। অনুরূপভাবে আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ- অর্থ হযরত আলী ও ইমাম হোসাইনের উছিলায় প্রাপ্ত সন্তান। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এসব নাম রাখা জায়েজ। যেমনঃ আলী বখ্‌শ, রাসুল বখ্‌শ, আতা মোহাম্মদ, নবী বখ্‌শ, খোদা বখ্‌শ ইত্যাদি।

একটি মজার ঘটনাঃ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (ওহাবী) ছিলেন সকল দেওবন্দী ওলামাদের প্রথম কাতারের কুতুব। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

পিতৃবংশঃ

মাওলানা রশিদ আহমদ ইবনে মাওলানা হেদায়েত আহমদ ইবনে কাজী পীর বখ্‌শ ইবনে গোলাম হাসান ইবনে গোলাম আলী।

মাতৃবংশঃ

মাওলানা রশিদ আহমদ ইবনে কারীমুন্নেছা বিনতে ফরিদ বখ্‌শ ইবনে গোলাম কাদির ইবনে মুহাম্মদ সালেহ্ ইবনে গোলাম মোহাম্মদ। (তাজকিরাতুর রশিদ ১ম খন্ড ১৩ পৃষ্ঠা)।

উক্ত বংশ তালিকায় দেখা যায়- রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর দাদার নাম পীর বখ্‌শ, দাদার পিতার নাম গোলাম হাসান এবং প্র পিতার নাম গোলাম আলী। মাতৃবংশে দেখা যায়- নানার নাম ফরিদ বখ্‌শ, নানার পিতার নাম গোলাম কাদির, তার দাদার নাম গোলাম মোহাম্মদ।

আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর পিতৃ ও মাতৃ পুরুষদের তিনজন করে মোট ছয়জন মুশরিক ছিলেন। ছয়জন মুশরিকের খান্দানে জন্ম গ্রহণ করে রশীদ আহমদ গাঙ্গহী কি করে মুসলমান ও হালাল জাদা হলেন- তা দেওবন্দী ওলামাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা। দয়া করে তারা জবাব দেবেন কি?

সপ্তদশ অধ্যায়

বুযর্গ ব্যক্তির নামের অজিফা পাঠ প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی بزرگ کانام بطور وظیفه جپنا (شرك ہے)

"কোন বুযর্গ ব্যক্তির নাম অজিফা হিসাবে জপন করা শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা ভুল সংশোধনঃ

চার তরিকার মুরিদগণ তাদের শাজরা শরীফ নিয়মিত ওজিফা হিসাবে পাঠ করে থাকেন। নবী করিম(দঃ) থেকে নিজের পীর পর্য্যন্ত অলী আল্লাহগণের নামের শাজরা শরীফ পাঠ করার প্রথা অলী-আল্লাহগণ শিক্ষা দিয়েছেন এবং মুরিদগণকে তালীম দিয়েছেন। এই প্রথাকে বুযর্গ ব্যক্তিদের নামের অজিফা বলা হয়। এই প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করেই থানবী সাহেব বেহেস্তী জেওরে শিরকের ফতোয়া দিয়েছেন। তার উক্ত ফতোয়া স্বয়ং নবী করিম(দঃ) এর উপরও বর্তায়। কেননা তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় বুযর্গ ব্যক্তিত্ব। শেখ সাদী(রহঃ) বলেছেনঃ

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر -

"হে রাসুল(দঃ)! খোদার পরে আপনিই বুযর্গতম ব্যক্তিত্ব। সংক্ষেপে এটাই আপনার চরম প্রশংসা"-শেখ সাদী (রহঃ)।

বুযর্গ ব্যক্তিগণের নামের অজিফা বলতে আরও বুঝায়- শাজরা শরীফ, দরূদে তাজ, দরূদে আকবর ইত্যাদি- যা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পাঠ করা হয়। উক্ত অজিফায় হুজুর (দঃ) এর নাম বার বার উচ্চারণ করা হয়। দালায়েলুল খায়রাত, হিজবুল বাহার, মজমুয়া সালাওয়াতে রাসুল, মজমুয়া ওজায়েফ প্রভৃতি গ্রন্থে অসংখ্য বার নবী করিম (দঃ)-এর নাম ওজিফা হিসাবে পাঠ করা হয়। এছাড়াও শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী আল-ইন্তিবাহ্ গ্রন্থে নাদে আলী অজিফা দৈনিক ১১ বার পড়ার নিয়ম বলেছেন। ঐ অজিফায় ৩ বার ইয়া আলী, ইয়া আলী, ইয়া আলী উল্লেখ আছে। হযরত আলী (রাঃ)কে ঐ অজিফায় ৩ বার ইয়া আলী বলে সম্বোধন করা হয়েছে বলে উক্ত অজিফার নাম নাদে আলী রাখা হয়েছে। আর থানবী সাহেব যে কোন বুযর্গ ব্যক্তির নামের অজিফাকে শিরক বলে বেহেস্তী জেওরে ফতোয়া দিয়েছেন। তার উক্ত ফতোয়ার ফলে সমস্ত তরিকতের পীর মাশায়েখগণ- যেমন হিযবুল বাহার, দালায়েলুল খায়রাত ও নাদে আলী অজিফার প্রণেতাগণ সকলেই মুশরিক প্রমাণিত হয়ে যান। কেননা ঐ সব

অজিফায় বার বার নবী করিম (দঃ) এর নাম লওয়া হয় এবং শাজরা শরীফ হচ্ছে তরিকতের পীর পরম্পরার সনদ। যেমন বুখারী শরীফ বা মুসলিম শরীফের প্রতিটি হাদীস পাঠ করার পূর্বে রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম সনদ হিসাবে পাঠ করতে হয়। তারা প্রত্যেকেই এক একজন বুযর্গ ব্যক্তিত্ব! যত হাজার হাদীস পাঠ করা হয়, তত হাজার বারই রাবীদের নাম আগে পাঠ করতে হয়। তবে কি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐ সমস্ত বুযর্গ মনিষীদের নাম জপন করে মুশরিক হয়ে গেছেন? নাইজুবিল্লাহ মিন্ জালিক। থানবী সাহেব কত কৌশলে অথচ সংক্ষেপে বলে দিলেন যে, কোন বুযর্গ ব্যক্তির নাম অজিফা হিসাবে জপন করা শিরক। জনগণ এসব ধোকাবাজী কি করে ধরতে পারবে? আওয়াম তো দূরের কথা-হঠাৎ করে কোন আলেমের পক্ষেও ঐ কথার ইঙ্গিত অনুধাবন করা সহজ নয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আল্লাহ্ ও রাসুলের ইচ্ছায় কোন কাজ সমাধা হওয়া প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

یوں کہنا کہ خداورسول چاہیگا تو فلاں کام ہوجاویگا (شرک ہے)

"আল্লাহ্ এবং রাসুল চাইলে অমুক কাজটি হয়ে যাবে"- এভাবে বলা শিরক্। (১ম খন্ড-৪০ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ বা সংশোধনঃ

থানবী সাহেবের উক্ত ফতোয়া সম্পূর্ণ গলদ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর মিথ্যা অপবাদ স্বরূপ। থানবী সাহেব মূলতঃ তার পূর্ববর্তী ওহাবী নেতা ইসমাইল দেহ্লভীর তাক্ভিয়াতুল ঈমান এবং নজদী ওহাবী নেতা ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর কিতাবুত তাওহীদকে অনুসরণ করেই এরূপ মন্তব্য করেছেন। ইসমাইল দেহ্লভী তাকভিয়াতুল ঈমানে লিখেছেঃ

یہ خاص اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں - رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا -

"ইচ্ছা করলেই কিছু হয়ে যাওয়া-ইহা খাছ আল্লাহর শান। এর মধ্যে কোন সৃষ্টিরই দখল (ক্ষমতা) নেই, রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না"।

ইসমাইল দেহ্লভী আরও লিখেছেঃ

یایوں کہے اللہ ورسول چاہیگا تو میں آونگا .... سو ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے - اسکو اشراک فی العادۃ کہتے ہیں -

অর্থঃ "অথবা এরূপ বলা যে, আল্লাহ্ ও রাসূল যদি চাহেন তবে আমি আসবো। উপরোক্ত কথাগুলোর দ্বারা শিরক প্রমাণিত হয়। এধরনের শিরক্কে "অভ্যাসগত শিরক" বলা হয়। (তাক্ভিয়াতুল ঈমান- শিরক অধ্যায়)

এখন আমরা প্রমাণ করবো- এরূপ কথা স্বয়ং নবী করিম(দঃ) এর উপস্থিতিতে সাহাবাগণ বলতেন। কিন্তু নবী করিম(দঃ) নিষেধ করেন নাই। বরং সামান্য সংশোধন করে বলার পরামর্শ দিয়েছেন মাত্র। প্রমাণ নীচে দেখুন।

১নং দলীলঃ

নবী করিম(দঃ)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম এরূপ বলতেনঃ "আল্লাহ ও রাসুল চাইলে আমি এই কাজটি করবো অথবা এই কাজটি হয়ে যাবে"। তখন ব্যাপকভাবে এই প্রথা চালু ছিল। নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে বাধা দিতেন না বা এ কাজকে শিরকও বলতেন না। এই ছিল সাধারণ অবস্থা। কিন্তু ওহাবী খেয়ালের এক ইহুদী এসে বললো-"তোমরা তো আল্লাহ ও রাসুলকে এক করে ফেলেছো"। ঐ ইহুদীর বদ্গুমানী দূর করার জন্য আল্লাহর রাসুল (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে ঐ বাক্যটি একটু সংশোধন করে বলার জন্য পরামর্শ দিয়ে বললেনঃ তোমরা এভাবে বল্বে- "আল্লাহ ইচ্ছা করলে; অতঃপর আল্লাহর রাসুল ইচ্ছা করলে এই কাজটি করবো অথবা এই কাজটি হয়ে যাবে"। আরবীতে হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

لَا تَقُولُوا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ -

অর্থঃ তোমরা এভাবে বলিওনা যে, "আল্লাহ ও রাসুল যা চাহেন- তা হবে"। বরং এভাবে বলিও- "আল্লাহ যা চাহেন; অতঃপর হযরত মুহাম্মদ(দঃ) যা চাহেন- তা হবে"।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়-উক্ত হাদীসে নবী করিম(দঃ) বাক্যটি ঠিক রেখে শুধু وَاوْ (ওয়াও) পরিবর্তন করে তদস্থলে- ثُمَّ (ছুম্মা) বলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু "ইচ্ছা" শব্দটি বহাল রেখেছেন। ব্যবধান হলো শুধু وَاوْ এর স্থলে ثُمَّ। وَاوْ অর্থ বাংলাতে "এবং" : আর ثُمَّ অর্থ অতঃপর বা পরে। অতএব হাদীসের সরল অর্থ হলোঃ তোমরা আল্লাহর রাসুলের ইচ্ছাকে وَاوْ দ্বারা একসাথ না করে ثُمَّ দ্বারা আগপিছ করে দাও এবং বলোঃ "আল্লাহর ইচ্ছা হলে, অতঃপর রাসুলেরও ইচ্ছা হলে অমুক কাজটি করবো বা হবে"।

এখানে শুধু আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রথমে আল্লাহর ইচ্ছা, তারপর রাসুলের ইচ্ছা বলার জন্য নির্দেশ হয়েছে। এখানে শিরক-এর প্রশ্নই আসে না। নবী করিম (দঃ) শিরক শব্দ উল্লেখ করেননি। সুতরাং থানবী সাহেব ও ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক উক্ত কথাকে শিরক বলাটা বাড়াবাড়ি এবং রাসুলের উপর খোদকারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২নং দলীলঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবু দাউদ-এর সূত্রে মিশকাত শরীফে সাহাবী হযরত হোজায়ফা(রাঃ)-এর সংক্ষেপে বর্ণিত হাদীসখানা নিম্নরূপ সংকলন করা হয়েছেঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ -

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা(রাঃ) বর্ণনা করেন–"নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেন– তোমরা এভাবে বলোনা যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুকে যা ইচ্ছা করে- তা হবে; বরং এভাবে বলো–"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন; অতঃপর অমুকে যা ইচ্ছ করে- তা হবে"।

এর সাথে মিশকাত শরীফে একথাও উল্লেখ আছে যে, رِوَايَةً مُنْقَطِعًا অর্থাৎ অন্য এক রেওয়ায়াতে উপরোক্ত হাদীসকে মুন্‌কাতা' বলা হয়েছে। মুন্‌কাতা' বলা হয়–যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সনদ পরম্পরায় রাসুল(দঃ) পর্যন্ত مُتَّصِلْ (সংযুক্ত) নহেন। অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কেউ বাদ পড়েছে। এমন হাদীস আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। মুন্‌কাতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন شَرْحُ السُّنَّةِ নামক হাদীস গ্রন্থে। সুতরাং থানবী সাহেব ও ইসমাইল দেহলভী মিশকাতের رِوَايَةً مُنْقَطِعًا শব্দটি উল্লেখ না করেই হাদীসখানা বর্ণনা করে ধোকাবাজীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং حَدِيْثْ مُتَّصِلْ বা রাবী পরম্পরায় নবী করিম (দঃ) পর্যন্ত সংযুক্ত বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এটা গর্হিত কাজ। হাদীসে মুনকাতা-কে হাদীসে মুত্তাসিল হিসেবে চালিয়ে দেয়া ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩নং দলীলঃ

ইমাম ইবনে মাজা হাসান সনদে এবং ইবনে আবি শায়বা, তাব্‌রানী, ইমাম বায়হাকী ও অনান্য হাদীসবেত্তাগন পটভূমিকা সহ উক্ত হাদীস খানা নিম্নরূপ বর্ননা করেছেন।

اِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَأٰى فِى النَّوْمِ اَنَّهٗ لَقِىَ رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ اَنْتُمْ لَوْلَا اَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اَنْ كُنْتُ لَاَعْرِفُهَا لَكُمْ قُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مَاشَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ- طَبْرَانِىْ - بَيْهَقِىْ-اِبْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ)

অর্থ "জনৈক সাহাবী (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন- একজন ইহুদী স্বপ্নে তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেঃ যদি তোমরা শিরক না করতে, তবে তোমরা অতি উত্তম জাতি ছিলে। তোমরা (সাহাবীরা) বলে থাকো- আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (দঃ) যা চান- তা হবে"। ঐ সাহাবী নিজের স্বপ্ন বৃত্তান্ত রাসুলে খোদা (দঃ) এর নিকট পেশ করলেন। শুনে নবী করিম (দঃ) মন্তব্য করলেন" শুন! তোমাদের ঐ ধরনের কথা সম্পর্কে আমিও খেয়াল করেছি। তোমরা ঐ ভাবে না বলে বরং এভাবে বলোঃ 'আল্লাহ যা চান; অতঃপর মুহাম্মদ (দঃ) যা চান, তা হবে" । (ইবনে মাজা, ইবনে আবি শায়বা, বায়হাকী, তারবানী ও অনান্য মোহাদ্দেসীন)

উপরোক্ত হাদীস থেকে ইমাম আহম্মদ রেজা খান ফজেলে বেরেলভী (রাঃ) নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রমান করেছেন। যথাঃ -

(ক) - উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে- নবী করিম (দঃ) এর সাহাবীগন ব্যাপকভাবে ("মাশা আল্লাহ ওয়া মাশাআ মুহাম্মদ") "আল্লাহও রাসুল যা চান" কথা ব্যবহার করতেন। নবী করিম (দঃ) ও তা অবগত ছিলেন- কিন্তু নিষেধ করেননি। থানবী সাহেব এবং ইসমাইল দেহলভী এই কথাকে শিরক বলে প্রকারান্তরে সাহাবীগনকেই মুশরিক বলে আখ্যায়িত করেছে (নাউজু বিল্লাহ)। অথচ নবী করিম (দঃ) তা দেখেও নিষেধ করেননি ।

(খ) - হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর মামাতো ভাই হযরত তোফায়েল (রাঃ) এর বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেছেনঃ

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِى الْحَيَاءُ مِنْكُمْ اَنْ اَنْهٰكُمْ عَنْهَا لَاتَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَمَاشَاءَ مُحَمَّدٌ *

অর্থাৎ - তোমরা এমন একটি বাক্য ব্যবহার করছো - তোমাদের মর্যাদার কারনে যা থেকে আমি বারন করিনি। তোমরা এভাবে বলিওনা যে, আল্লাহ যা চান এবং রাসুল যা চান" । এই হাদীসে দেখা যায় যে, সাহাবীগন ঐ বাক্যটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু নবী করিম (দঃ) তাদের মর্যাদার খাতিরে নিষেধ করেননি বরং বলার অনুমতি ছিল। যদি ঐ রূপ বলা শিরক হতো, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি বারন করতেন।

থানবী সাহেব ও তার নেতার কথা অনুযায়ী নবী করিম (দঃ) জেনে শুনে তাঁদেরকে এতদিন শিরক শিক্ষা দিয়েছেন (নাউজু বিল্লাহ)। সুতরাং বুঝা গেল -এটা শিরক নয় বরং আদবের খেলাফ।

(গ) - নবী করিম (দঃ) ঐ বাক্যটিই সামান্য সংশোধন সাপেক্ষে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'এবং' না বলে বরং 'অতঃপর' যোগে বলোঃ আল্লাহ যা চান অতঃপর মুহাম্মদ (দঃ) যা চান- তা হবে"। অথবা এভাবে বলোঃ আগে আল্লাহর ইচ্ছা, পরে হুজুরের ইচ্ছা।

(ঘ) - আল্লাহর ইচ্ছা ও রাসুলের ইচ্ছাকে وَاوْ (ওয়াও) অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত করা ছিল সাহাবীগনের অভ্যাস বা সুন্নাত। কিন্তু এ ব্যাপারে আপত্তি করা হচ্ছে ইহুদী স্বভাব । ইহুদীরা আল্লাহর সাথে নবীর নাম সংযুক্ত করাকে পছন্দ করেনি। কিন্তু নবী করিম (দঃ) ثُمَّ (ছুম্মা) অব্যয় দ্বারা ঐ সংযুক্তিকেই বহাল রাখলেন। বুঝা গেল- আল্লাহর নাম থেকে রাসুলের নাম বাদ দেয়া বা পৃথক করা ইহুদীদের স্বভাব। আর আল্লাহর নামের সাথে রাসুলের নাম যোগ করা ঈমানদারের স্বভাব। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন কাজে আপন প্রিয় রসুলের নাম নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করে কোরআন মজিদে প্রায় ৪৫টি আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

থানবী গ্রুপের প্রতি অনুবাদকের পাল্টা চ্যালেঞ্জঃ

থানবী সাহেব এবং ইসমাইল দেহলভী আল্লাহর ইচ্ছাকেই একমাত্র বৈধ মনে করে। রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয়না- বলে ইসমাইল দেহলভী তাকভিয়াতুল ঈমানে ঘোষনা দিয়েছে। রাসুলের ইচ্ছায় কোন কাজ হওয়ার বিশ্বাসকে তারা উভয়েই শিরক বলেছে। এখন দেখা যাক, কোরআন মজিদে কি কি কাজ বা কোন ক্ষেত্রে রাসুলের নাম আল্লাহর নামের সাথে وَاوْ (ওয়াও) অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে।

১। গরীবকে ধনবান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুলের সম্পৃক্ততা :

وَمَا نَقَمُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ (تَوْبَة- ٧٤)

মর্মার্থঃ "মুনাফিকরা গনীমতের মাল অধিক পরিমাণে না পাওয়ার কারনে রাসুলের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারা কি চিন্তা করে দেখেনি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই আপন অনুগ্রহে তাদেরকে ধনবান করেছেন" ।(সুরা তাওবা আয়াত ৭৪)। এখানে "রাসুল (দঃ) আল্লাহর সাথে যৌথভাবে ধন দৌলত দিয়েছেন" বলা হয়েছে।

২। কিছু দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুলের যৌথ ভূমিকাঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَااٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ (توبه ٥٩)

মর্মার্থ "মুনাফিকদের জন্য কতই না ভাল হতো, যদি তারা সন্তুষ্ট হতো-আল্লাহও তাঁর প্রিয় রাসুল যৌথভাবে যা কিছু তাদেরকে দান করেছেন- তার উপর"। (তৌবা- ৫৯ আয়াত) এ আয়াতে আল্লাহও রাসুল দান করেন" বলা হয়েছে।

৩। মানুষের আমল দেখা ও প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুল এক :

وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ (توبه -٩٤)

মর্মার্থঃ " আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ) যৌথভাবে তোমাদের আমল সমূহ প্রত্যক্ষ করবেন" ।(সুরা তাওবা ৯৪ আয়াত)। এ আয়াতে আল্লাহ ও রাসুলের ভূমিকা এক। রাসুল করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়বের এটি একটি দলীল।

৪। দ্বীনের কাজে আল্লাহ ও রাসুলের যৌথ আহবান :

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (اَنْفَالْ- ٢٤)

মর্মার্থঃ " হে ঈমানদার গন! আল্লাহ ও রাসুল যখন তোমাদেরকে আহবান করেন, তৎক্ষনাৎ তোমরা সাড়া দাও। কেননা এতেই তোমাদের প্রকৃত হায়াত নিহীত"। (সুরা আনফাল- ২৪ আয়াত) এখানে দ্বীনের আহবানের ক্ষেত্রে (ওয়াও) অব্যয় দ্বারা আল্লাহর সাথে রাসুলের নাম যোগ করা হয়েছে।

৫। আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহও রাসুল একঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ (آل عمران ٣٢)

মর্মার্থ : হে রাসুল! আপনি একথা ঘোষণা করুন- "তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর"। (সুরা আলে ইমরান ৩২ আয়াত)। এখানে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যকে সমান সমান বলা হয়েছে। শরয়ী আহকামে আল্লাহ ও রাসূল এক এবং অভিন্ন। আল্লাহর ইচ্ছাই রাসুলের ইচ্ছা এবং রাসুলের ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা। রাসুলের আনুগত্য মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য। ৫ম পারায় এরশাদ হয়েছে -" যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো"। জাতে ভিন্ন হলেও শরীয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল এক। ইহাই সর্বসম্মত মত।

৬। নাফরমানীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে রাসূল যুক্ত।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ-وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا -

মর্মার্থ : " আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন কোন মুমিন নরনারীর পক্ষে তা মানা- না মানার এখতিয়ার নেই। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর

রাসুলের নাফরমানী করবে এবং নির্দেশ অমান্য করবে, সে স্পষ্টভাবেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল"। (সুরা আহ্‌যাব ৩৬ আয়াত)

উক্ত আয়াতে নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে রাসুল (দঃ) সংযুক্ত। আবার নাফরমানীর ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে যুক্ত।

এভাবে আল্লাহর সাথে রাসুল (দঃ) وَاوْ অব্যয় দ্বারা যুক্ত রয়েছেন ৪৫ টি আয়াতে। যথাঃ

(ক) সুরা আলে ইমরান -১বার
(খ) সুরা নিছায় - ৪ বার
(গ) সুরা মায়েদায় -২ বার
(ঘ) আনফালে - ৪ বার
(ঙ) সুরা তাওবায় - ১৩ বার
(চ) সুরা নূর এ - ৩ বার
(ছ) সুরা আহযাবে - ৬ বার
(জ) সুরা ফাত্‌হ - ১ বার
(ঝ) সুরা হুজরাত - ২ বার
(ঞ) সুরা হাদীদে - ২ বার
(ট) সুরা হাশর - ২ বার
(ঠ) সুরা মুনাফিকুন - ১ বার
(ড) অন্যান্য সুরায় - ৪ বার
৪৫ বার

(সুত্র ঃ জিকরে জামিল- হযরত শফী ওকারভী রহঃ)

কোরান মজিদের ন্যায় হাদীস শরীফেও অসংখ্য স্থানে আল্লাহ ও রাসুলকে হরফে আত্‌ফ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। দু' একটি উদাহরন নিম্নে দেখুন। যথাঃ

ক। আল্লাহ ও রাসুল সর্বজ্ঞঃ

মিশকাত শরীফ হাদীসে জিব্রাইলের মধ্যে নবী করিম (দঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন- আগন্তুক ব্যক্তি কে ছিলেন, তুমি কি তাঁকে চিন? তদুত্তরে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেনঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎঃ "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলই সর্বজ্ঞ"। এখানে আল্লাহর সাথে রাসুলকেও সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে। সুতরাং রাসুল করিম (দঃ)কে সর্বজ্ঞ বলা জায়েজ।

খ। আল্লাহ- অতঃপর আমি যা চাই- তাই হয়ঃ

নাছায়ী শরীফে সহিহ্ সনদে জনৈক ইহুদীর একটা ঘটনা এভাবে বর্নিত হয়েছেঃ

عَنْ شِعْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قَتِيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِىْ جُهَنِيَّةٍ قَالَتْ اِنَّ يَهُوْدِيًّا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُنَدِّدُوْنَ وَاِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتُ وَتَقُوْلُوْنَ وَالْكَعْبَةِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يَّحْلِفُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُوْلَ اَحَدٌ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتُ - *

অর্থঃ মিছআর মা' বাদ ইবনে খালেক থেকে, তিনি আবদুল্লা ইবনে ইয়াছার থেকে, তিনি ক্বাতিলা বিন্‌তে ছাইফী জোহানীয়া থেকে বর্ননা করেছেন, ক্বাতিলা (রাঃ) বলেনঃ জনৈক ইহুদী রাসুলে খোদা (দঃ)-এর খেদমতে এসে বললো ঃ আপনারা দুটি কাজে খোদার সাথে শিরক করেছেন। একটি হচ্ছে - যখন আপনারা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন বলে থাকেন "আল্লাহ চাইলে এবং আমি চাইলে" এ কাজটি হবে। অন্যটি হচ্ছে- যখন কেউ কসম করে, তখন বলে -'কাবার কসম"। তখন নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা যখন শপথ করবে, তখন এভাবে বলবে - "কাবার মালিকের শপথ" । আর বলবে- "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন" অতঃপর আমি যা ইচ্ছা করি- তা হবে"।

উক্ত হাদীসে দুটি বিষয় প্রমানিত হলো। যথাঃ-

১। কা'বার নামে সাহাবাগন প্রথমে শপথ করতেন। নবী করিম (দঃ) এতদিন কিছু বলেননি। ইহুদীর কাছে এটা আপত্তিজনক মনে হওয়ায় নবী করিম (দঃ) তদস্থলে কা'বার মালিকের শপথ করতে পরামর্শ দিলেন। ঐ কাজকে তিনি শির্‌ক বলেননি। বরং ইহুদী শির্‌ক বলেছে। বুঝা গেল-শিরকের ফতোয়াবাজী ইহুদীর কাজ।

২। "আল্লাহর ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছা" সাহাবাগনের এ কথায় প্রথমে নবী করিম (দঃ) কোনই আপত্তি করেন নি। বরং বলার অনুমতি ছিল। এতে প্রমানিত হলো- সাহাবাগণ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজেদের ইচ্ছাও وَاوْ দ্বারা যোগ করতেন। পরে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর ইচ্ছা ও ব্যক্তির ইচ্ছাকে ثُمَّ (ছুম্মা) অব্যয় দ্বারা যোগ করার পরামর্শ দেন। এতে প্রমাণিত হলোঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে রাসুলের ইচ্ছা অথবা ব্যক্তির ইচ্ছা ثُمَّ অব্যয় দ্বারা যোগ যোগ করা যাবে। তবে আল্লাহর ইচ্ছা আগে, তারপর ব্যক্তির ইচ্ছা

করা উত্তম। বিভিন্ন কাজে আল্লাহর সাথে রাসুল মকবুল (দঃ) কে واؤ দ্বারা সংযুক্ত করা আল্লাহরই বিধান। থানবী পন্থীরা ৪৫টি আয়াত সম্পর্কে কি বলবেন?

অথচ থানবী সাহেব ও ইসামাইল দেহলভী বলেছে " ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহর সিফত। মুহাম্মদের (দঃ) ইচ্ছায় কিছুই হয়না"। (নাউজু বিল্লাহ)। নবী দুশ্‌মনির এটা উজ্জ্বল প্রমান। নবী করিম (দঃ) যে কাজকে শির্‌ক বলেননি, থানবী সাহেব বেহেস্তী জেওরে এবং ইসমাইল দেহ্‌লভী তাকভিয়াতুল ঈমানে সে কাজকে কি করে শির্‌ক বললেন? এটা তাদের ইসলামের অপব্যাখ্যা বললে মোটেই ভুল হবে না।

একটি সন্দেহ খন্ডনঃ

ওহাবী সম্প্রদায় তাদের দাবীর স্বপক্ষে শরহে সুন্নাহর একটি হাদীস উপস্থাপন করে থাকে - যা মিশকাত শরীফে بَابُ الْاَسَامِيْ অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ (شَرْحُ السُّنَّةِ)

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা (রাঃ) সূত্রে বর্নিত হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেনঃ তোমরা এভাবে বলিও না- "আল্লাহ এবং রাসূল মুহাম্মাদ (দঃ) যা ইচ্ছা করেন", বরং এভাবে বলো "একা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা হবে"। (শরহে সুন্নাহ ও মিশকাত)।

ইসমাইল দেহ্‌লভী উক্ত হাদীস উল্লেখ করে পার্শ্ব টিকায় নিজের মন্তব্য এভাবে লিখেছে- " ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহর সিফাত। এতে অন্যের কোন দখল নেই। সুতরাং মুহাম্মদ (দঃ)-এর ইচ্ছায় কিছুই হয় না"। পাঠক সমাজ! আল্লাহর রাসুল (দঃ) বললেন কি, আর ইসমাইল দেহলভী ব্যাখ্যা করলো কি? সে কোন উদ্ধৃতি ও পেশ করেনি।

এবার পাঠক লক্ষ্য করুন! উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়- কে কি মন্তব্য করেছেন।

ক। আল্লামা তিবী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْمُوَحِّدِيْنَ وَمَشِيَّتُهٗ مَغْمُوْرَةٌ فِىْ مَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمُضْمَحِلَّةٌ -

অর্থাৎ- "নবী করিম (দঃ) যেহেতু তৌহীদবাদীগণের সর্দার এবং তাঁর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই মিশ্রিত ও বিলীন। সুতরাং পৃথক করে তাঁর ইচ্ছার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই"।

খ। ইমাম আহমদ রেজা খান (রাঃ) বলেন ঃ

"عطف واؤ سے ہوخواہ ثم سے خواہ کسی حرف سے معطوف ومعطوف علیہ میں مغائرت چاھتاہے بلکہ ثم بوجہ افادۂ فصل وتراخی زیادہ مفید مغائرت ہے اور سید المؤحدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لئے کوئی مشیت جدا گانہ اپنے رب کی مشیت سے رکھی ہی نہیں- انکی مشیت بعینہ خدا کی مشیت ہے اور مشیت خدا بعینہ انکی مشیت ہے - اور اگر عطف کر کے کہے تو دوئی سمجھی جائیگی کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور رسول کی اور" (امام احمد رضا فی رد اسماعیل دہلوی)

অর্থঃ ইসমাইল দেহলভীর উদ্ধৃত উপরোক্ত হাদীস খানায় 'ওয়াও' বা 'ছুম্মা' কোন প্রকারের হরফে আত্‌ফ না থাকার একটি সুক্ষ্ম কারণ আছে।

অন্যান্য হাদীসে হরফে আত্‌ফ দ্বারা রাসুলকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হলেও অত্র হাদীসে তা না করার পেছনে একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব নিহীত আছে। আর তা হচ্ছে "হরফে আত্‌ফ ওয়াও দ্বারা হউক কিম্বা 'ছুম্মা' দ্বারা হোক অথবা অন্য কোন হরফ দ্বারাই হোক, তা সব সময় আগের ও পরের ব্যক্তি বা مَعْطُوْف وَ مَعْطُوْف عَلَيْهِ এর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ দুজন বুঝা যায়। বক্ষমান হাদীসে তা উল্লেখই করা হয়নি। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। যাতে দুই বুঝা না যায়। কেননা, নবী করিম (দঃ) হচ্ছেন সাইয়েদুল মোত্তয়াহ্‌হেদীন। তিনি ইচ্ছা করেই এই হাদীসে আল্লাহর ইচ্ছার পাশাপাশি নিজের পৃথক ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব রাখেননি। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর ইচ্ছা-ই আল্লাহর ইচ্ছা। এখানে কোন পার্থক্য নেই। যদি وَاؤْ অথবা ثُمَّ লাগিয়ে নিজের ইচ্ছা যোগ করতেন, তাহলে দুই অস্তিত্ব বুঝা যেতো যে, আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন এবং রাসুলের ইচ্ছাও ভিন্ন। সুতরাং এই হাদীসে গভীর সুফী তত্ত্ব নিহীত রয়েছে- যাকে তাসাউফের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ বলা হয়। ওহাবী সম্প্রদায় ঐ সব ব্যাখ্যা পাশ কাটিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখছে।

মোদ্দা কথাঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে ثُمَّ " অতঃপর" শব্দ যোগ করে বান্দার ইচ্ছাকে সংযুক্ত করা জায়েজ। তা কোন মতেই শিরক নয়-- যেমন বলেছে থানবী সাহেব ও ইসমাইল দেহলভী। খোদা তায়ালা আমাদেরকে সত্য উপলব্ধির তৌফিক দিন।

নোটঃ পান্ডুলিপি লেখার কাজ রোববার ১২ই কার্তিক ১৪০৩ বাংলা, ১৩ই জমাদিউস সানী ১৪১৭ হিজরী, ২৭শে অক্টোবর ১৯৯৬ইং শেষ করা হলো। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের রেজামন্দির উদ্দেশ্যে এবং লোকের হেদায়াতের নিয়তে একাজ সমাপ্ত করা হলো। এখানে শুধু বেহেস্তী জেওরের আকায়েদ খন্ডের রদ লিখা হলো। বাংলাদেশের সুন্নী উলামা সমাজের জন্যে অত্র গ্রন্থখানী সহায়ক হবে বলে আশা করতে পারি।

খাদেমুল ইল্‌ম
হাফেজ মোঃ আব্দুল জলিল
অধ্যক্ষ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা,
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা
বাংলাদেশ।

(বিঃ দ্রঃ) উর্দু ইস্‌লাহে বেহেস্তী জেওরের কেবল প্রয়োজনীয় অধ্যায় গুলোর অনুবাদ করা হয়েছে। কিছু কিছু অধ্যায় অনুবাদ করা হয়নি। যেহেতু এটি সংকলন। তাই- বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ-ই শুধু করা হয়েছে- গ্রন্থকার।

লেখকের [illegible]

লেখকের নাম ঃ হাফেয মোঃ আবদুল জলি[illegible] যহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী। **পিতার নাম ঃ** মুন্সী আদম আলী [illegible] মাতার [illegible] খাতুন। জন্ম ঃ ২৬শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

জন্মস্থান ঃ গ্রাম আমিয়াপুর, **পোষ্ট ঃ** পাঠান বাজার, **থানা ঃ** মতলব (উঃ), **জেলা ঃ** চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফেকাহবিদ আলিম এবং বাদশাহ্ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) ছিলেন লেখকের উর্ধতন পুরুষ। হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) রচিত ফেকাহ্র নীতিশাস্ত্র নূরুল আনোয়ার গ্রন্থাখানা দুনিয়া ব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল জামাতের পাঠ্যগ্রন্থ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সুত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন ঃ লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফ্য আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে ১৯৫৩ ইং হিফ্য শেষ করেন। তারপর ১৯৫৫ সালে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৯৫৬ ইং ১৯৬৪ ইং সালে উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ও এম,এ, (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে ষ্টাইপেন্ডসহ পাস করেন ১৯৬৬-১৯৭০ ইং সালে। আরবী ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৭২ সালে কলেজের অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও লাকসাম ফয়জুন্নেসা কলেজে চার বৎসর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষার পাশাপাশি জীবিকার নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ ইং সামান্য বিরতিসহ হযরত তারেক শাহ্ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ ইং সালে ১বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রভেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ ইং বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জে বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পূণরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ ইং সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭-৯০ ইং ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করে পূনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়বিয়্যা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব ও ওয়াজ নসিহত এবং আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বুখারী শরীফ সহ তার লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত ১৭ খানা গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক সুন্নীবার্তা নিয়মিত প্রকাশ করেছেন।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৮০ ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফ হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর মাযার শরীফসহ বহু মাযার জিয়ারত করে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ ইং সালে ইরাক সরকারের নিমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশ মোদাররেছিন প্রতিনিধি দলের সাথে গমন করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাগদাদ শরীফের গাউসূল আযম (রাদিঃ) এর মাযার সহ অসংখ্য নবী ওলীর মাযার যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ ইং ১৯৮৫ ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহবানে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্জ ও ওমরাহ্ পালন করেন। ১৯৯৯ ইং সালে লন্ডন এবং ২০০৩ ইং সালে সুইডেন, লন্ডন ও দুবাই সফর করেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে ছুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে বহুতল বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। ১৯৯৭ ইং ২৭শে নভেম্বর তারিখে বাগদাদ শরীফের বর্তমান গদীনশীন মোতাওয়াল্লী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান আল জিলানী সাহেব (মাঃজিঃআঃ) তাঁকে লিখিত খেলাফতনামা প্রদান করেছেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

তারিখ ঃ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং